ভাবার সময়

বুদ্ধদেব গুহ

পরিবেশক

দে বুক স্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৭৩

আমাদের প্রজন্মের মেরুদণ্ডহীন,
পরিশ্রম-বিমুখ, আত্ম-বিস্মৃত
বাঙালীদের হাতে

আমাদের প্রকাশিত বুদ্ধদেব গুহ'র অন্যান্য বই

পলাশতলীর পড়শী

শ্রেষ্ঠ গল্প

কোজাগর

পারিধী

সোপর্দ

পঞ্চম প্রবাস

প্রথম প্রবাস

বনবাসর

চবুতরা

প্রথমাদের জন্যে

স্বগতোক্তি

লবঙ্গীর জঙ্গলে

জলছবি, অনুমতির জন্যে

আয়নার সামনে

জঙ্গল মহল

দূরের দুপুর

দূরের ভোর

যাওয়া-আসা

মহড়া

নাজাই

ঝাঁকি দর্শন

জঙ্গলের জার্নাল

সুখের কাছে

ভূমিকা

এই বই আদৌ লেখা উচিত হবে না, এমন কথা আমার প্রজন্মের অনেক বুদ্ধিমান বাঙালীই বলেছিলেন। বলেছিলেন, সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়ার দরকার কি?

অনেক ভাবাভাবির পর 'ভাবার সময়' না লিখে পারলাম না। আমি আমার এই সুন্দর স্বরাট মহিমামণ্ডিত দেশকে ভালোবাসি। পৃথিবীর বহু দেশ দেখে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষের মতো সুন্দর দেশ পৃথিবীতে নেই। এই দেশের সাধারণ গ্রামীণ মানুষদের মতো ভালো মানুষও কোথাওই নেই। শুধু দেশে মানুষ যদি কিছু কম থাকতো, আর মানুষের মতো মানুষ যদি কিছু বেশি থাকতো তবে এই দেশকে সোনার দেশ করেই গড়ে তোলা যেতো।

বাঙালীদের পক্ষে কলম ধরেছি তা ঠিক। তবে আমি আদৌ প্রাদেশিক নই। দেশকে ভালোবাসা যদি দেশদ্রোহিতা হয় তবে আমি দেশদ্রোহী। সত্যি কথা সোজা করে বললে যদি দোষ হয়, তাহলে আমি দোষী। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দলের প্রতিই আমার বিন্দুমাত্র বিরূপতা নেই। দেশের স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ-এর কথা ভেবেই যা বলার তা বলেছি।

আপনাদের অনেকের তিরস্কার এবং কারো কারো প্রশংসার জন্যেও নিজেকে মনে মনে তৈরী করেও নিয়েছি।

ভারতের এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর কল্যাণ কামনা করে, বিনত—

বুদ্ধদেব গুহ

"কুছ খাফাজ্ কি তি'লীয়োসে ছান্ রাহা
হ্যায় নূর্সা
কুছ্ ফিজা কুছ্ হাস্রাতে পরওয়্যাজ্ কি
বাতে করো"

—ফিরাখ্ গোরোখ্পুরী

দ্যাখো,

জ্যোতিরই মতো, জেলখানার গরাদ থেকে কী যেন আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসছে। এসো, কিছু পারিপার্শ্বিকতা আর কিছু পালাবার ইচ্ছার কথা বলাবলি করি আমরা।

এ কোন্ গরাদের কথা কবি বলেছেন কে জানে

তবে এই গরাদ বা গরাদ চুঁইয়ে-আসা এই জ্যোতি অথবা এই অজানা কয়েদ থেকে পালাবার ইচ্ছার মধ্যে কোনো বিশেষ সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের বিরুদ্ধে এক প্রত্যক্ষ সংগ্রামই যেন স্ফুরিত হয়েছে।
চেঁচিয়ে কিছু বলা হয়নি। রাগ করেও নয়।
তবু বলা হয়েছে অনেকখানিই।

—"মাধুকরী" থেকে উদ্ধৃত

ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা

এ বইটি লেখার প্রস্তুতি হিসেবে কিছু পড়াশুনা করতে হয়েছিলো এবং ভুলে-যাওয়া পড়াশুনা ঝালিয়ে নিতেও হয়েছিলো।

যে মানুষটি এবং যাঁর লেখা বইটির কাছে আমি সবচেয়ে বেশি ঋণী তিনি শ্রীরণজিত রায় (বর্তমানে "দৈনিক বসুমতী"র সম্পাদক) এবং তাঁর বই 'আগনী অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল'। প্রকাশক, নিউ এজ পাবলিশার্স।

রণজিতবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ এখনও হয়নি। তাঁকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাই। ওঁর বইটিতে যে-সব প্রবন্ধ আছে তার প্রায় সবকটিই 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং তৎকালীন 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এ প্রকাশিত।

নিউ এজ পাবলিশার্স-এর কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে বইটির একটি বাংলা সংস্করণও আছে। কতো পরিশ্রম করে এবং বাংলার প্রতি কতখানি ভালোবাসা নিয়ে যে তিনি ঐ বইটি লিখেছিলেন তা যিনি পড়বেন, তিনিই বুঝবেন। প্রত্যেক বাঙালীরই ঐ বইটি কিনে পড়া উচিত এবং অন্যদেরও পড়ানো উচিত। রণজিতবাবুর মতো বাঙালী-প্রেমী এবং সাহসী বাংলাদেশে আরও কিছু থাকলে আজ বাংলার এমন অবস্থা হয়তো হতো না।

ঐ বইটি ছাড়াও ঝালিয়ে-নেওয়া পড়াশুনোর মধ্যে প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিন-এর 'ভিয়েতনাম', জন লক-এর 'অন সিভিল গভর্ণমেণ্ট', জন স্টুয়ার্ট মিল-এর 'অন লিবার্টি', জাঁ জ্যাকস্ রুসোর 'দ্যা সোশ্যাল কনট্রাক্ট', হেনরী ডেভিড থোরোর 'সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স', অ্যালান্ আর বল্-এর 'মডার্ণ পলিটিকস্ অ্যান্ড গভর্ণমেণ্ট', 'কনস্টিটুট্যুশান অফ ইণ্ডিয়া', 'অকেশানাল স্পীচেস অ্যান্ড রাইটিংস অফ ডঃ এস. রাধাকৃষ্ণান, প্ল্যাটোর 'দ্যা রিপাপলিক্' ইত্যাদি।

এ ছাড়াও যে অসংখ্য বই 'ভাবার সময়' লিখতে কাজে লেগেছে তা সহজেই অনুমেয়। তাদের তালিকা দেওয়া থেকে তাইই নিরস্ত হলাম।

“কাম থ্রাসীম্যাকাস্ সেইড আই। লেট আস স্টার্ট অ্যাফ্রেশ উইথ আওয়ার কোয়েশ্চেনস্। ইউ সে ছ্যাট্ ইনজাস্টিস্ পেইজ বেটার ছ্যান্ জাস্টিস, হোয়েন বোথ আর ক্যারেড টু ছ্যা ফার্দেস্ট পয়েণ্ট ?

আই ডু।

হী রিপ্লায়েড, অ্যাণ্ড আই হ্যাভ টোল্‌ড্ ট্যু হোয়াই

অ্যাণ্ড হাউ উড ট্যু ডেমক্রাইব দেস্ ? আই সাপোজ ট্যু উড কল ওয়ান অফ দেম এন এক্সেলেন্স অ্যাণ্ড ছ্যা আদার আ ডিফেক্ট ?

অফ কোর্স।

জাস্টিস ইজ এক্সেলেন্স অ্যাণ্ড ইনজাস্টিস্ ইজ ডিফেক্ট ?

নাউ, ইজ ছ্যাট লাইকলি, হোয়েন আই অ্যাম টেলিং ট্যু ইনজাস্টিস্ পেইজ অ্যাণ্ড জাস্টিস ডাজ নট ?

দেন হোয়াট ডু ট্যু সে ?

ছ্যা অপোজিট।

ছ্যাট জাস্টিস ইজ অ্যা ডিফেক্ট ?

নো। রাদার্ ছ্যা মার্ক অফ আ গুড-নেচার্‌ড্ সিম্পল্‌টন।

ইনজাস্টিস্, দেন ইমপ্লাইজ বীয়িং ইল-নেচার্‌ড্ ?

নো। আই শুড কল ইট গুড পলিসী।

ড্যু ট্যু থিংক ছ্যাট আনজাস্টস্ আর পজিটিভলি স্যুপিরিয়র ইন ক্যারেকটার অ্যাণ্ড ইণ্টেলিজেন্স। থ্রাসীম্যাকাস্ ?

ইয়েস্। ইফ দে আর ছ্যা সর্ট ছ্যাট ক্যান ক্যারী ইনজাস্টিস্ টু

পারফেকশান অ্যাণ্ড মেক দেমসেল্‌ভস্‌ মাস্টার্‌স্‌ অফ হোল সিটিজ অ্যাণ্ড নেশনস্‌… ….” —“প্লাটোর” “দ্যা রিপাব্লিক” থেকে

উনিশশো সাতচল্লিশের চোদ্দ-পনেরো আগস্ট-এর মাঝরাতে জওহরলাল নেহেরু কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেমব্লীতে বলেছেন, তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা ‘ইণ্ডিয়া’স ট্রাইস্ট উইথ ডেসটিনী’তে “এ মোমেণ্ট কামস্‌, হুইচ্‌ কামস্‌ বাট রেয়াবলি ইন হিস্টরি… ..”

“হোয়েন উই স্টেপ আউট ফ্রম দ্যা ওল্ড টু দ্যা ন্যু, হোয়েন অ্যান এজ এণ্ডস এ্যাণ্ড হোয়েন দ্যা সোল অফ আ নেশান লং সাপ্রেসড ফাইণ্ডস আটারেন্স্‌। ইট ইজ ফিটিং দ্যাট এ্যাট দিস্‌ সলেম মোমেণ্ট উই টেক দ্যা প্লেজ টু দ্যা সার্ভিস অফ ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার পিপল এ্যাণ্ড টু দ্যা স্টিল লার্জার কজেস্‌ অব হিউম্যানিটি।”

স্বাধীনতার প্রাক্কালে যখন পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ করে স্বাধীনতার কথা উঠেছিলো তখন থেকেই কেন্দ্রীয় নেতারা এই দুই রাজ্য যে ‘ভিভিসেকটেড্‌’ হয়ে যাবে তা বার বার বলে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। ভারতের সব মানুষের কাছে এ কথাই বোঝাবার জন্যে যে, কী বিভীষিকার মধ্যেই না পড়লো এ দেশ! যদিও স্বাধীনতা এলো। ঐ দুই রাজ্যের হতভাগ্য মানুষদের একমাত্র সান্ত্বনার হলো এই যে, নতুন স্বাধীন দেশের নেতারা যখন এতখানি চিন্তিত তখন তাঁরা নিশ্চয়ই তাদের পাশে দাঁড়াবেন। এই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মোকাবিলায় সাহায্য করবেন।

কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম দিনেই বাঙালীরা আবিষ্কার করলেন যে ভারতীয় নেতাদের দরদ কতখানি খাঁটি। প্রথম দিনেই রাত বারোটার সময় বাংলার পাট রপ্তানীর যে ভাগ ব্রিটিশ আমলে প্রাপ্য ছিলো তা নির্মমভাবে ছেঁটে দেওয়া হলো। কারণ দেখানো হলো, পাট তো পূর্ববঙ্গই বেশী উৎপাদন করে। আর তাঁদের খেয়ালখুশিতে যে বাংলা দুর্যোগে পড়লো, ‘ভিভিসেকটেড্‌’ হলো সে কথা রাতারাতিই ভুলে গেলেন তাঁরা। নয়া-দিল্লীর কর্তারা এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করার মতো সৌজন্যটুকুও দেখালেন না। সেদিন থেকেই বাংলাকে গলাটিপে মারার চক্রান্তের সূত্রপাত।

মহাত্মা গান্ধীর মতো মানুষও ঐ নেতাদের চাপে নেতাজীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। বাঙালীকে তখন তাঁরা ভয় পেতেন। আজকে চল্লিশ বছর ধরে শুধু বাংলাই নয়, সমস্ত পূর্বাঞ্চলকে বঞ্চনা করে রবরবা ঘটেছে অন্যান্য অঞ্চলের। কিন্তু তাঁরা এমনই এক কঠিন অবস্থার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে ফেলে দিয়েছেন যে বাঙালীকে ভয় করার দিন আবার হয়তো ফিরে আসবে বাঙালীকে ওঁরা বড়ই আণ্ডার-এস্টিমেট করে ফেলেছেন। পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্য এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং তার অধিবাসীরা তাঁদের করুণার পাত্র এখন। উপহাসের বিষয়।

দেশ-বিভাগের ফল পশ্চিমবঙ্গের উপর যে কী সাংঘাতিক হয়ে আসবে তা তাঁরা জেনেও একটুও অপেক্ষা করার সৌজন্যটুকুও দেখাননি। স্বাধীনতার দিনের আরম্ভর মুহূর্তেই 'ভিভিসেকটেড্' বাংলাকে এই উপহার দিয়েছিলেন তাই।

মনে রাখা দরকার যে, তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাতে একজনও বাঙালী মন্ত্রী ছিলেন না। বাঙালী সেক্রেটারীও ছিলেন না একজনও। ত্রাণমন্ত্রী ছিলেন পাঞ্জাবী মেহেরচাঁদ খান্না। গত চল্লিশ বছরে যে সব বাঙালী কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার মন্ত্রীত্ব পেয়েছেন বা এম. পি. হয়েছেন তাঁদের মেরুদণ্ড, ব্যক্তিত্ব, সাহস এবং পশ্চিমবঙ্গর প্রতি দরদের কথা আলোচনা না করাই ভালো। তাঁরা কেউই বাঙালীর গর্ব হননি, লজ্জাই হয়েছেন। হ্যাঁ। প্রত্যেকেই। ব্যতিক্রম শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং গনি খান চৌধুরী সাহেব।

দ্বিতীয় আঘাতও এলো সেই প্রথম রাতেই। আয়করের ভাগ বাংলার ছিলো কুড়ি শতাংশ ব্রিটিশ আমলে। তাকে রাতারাতি কমিয়ে করা হলো বারো শতাংশ। আর বম্বের ভাগ তারই সঙ্গে কুড়ি শতাংশ থেকে বাড়িয়ে করে দেওয়া হলো একুশ শতাংশ। আর মাদ্রাজের ভাগ পনেরো শতাংশ থেকে বাড়িয়ে আঠারো শতাংশ করা হলো। পশ্চিমবঙ্গের ঐ বিপর্যয়ের মধ্যেও তার ভাগ কমিয়ে অন্য রাজ্যদের, আরও বড়লোক করা হলো প্রথম দিনেই। স্বাধীনতার প্রাক্কালে বাংলা ও বম্বেই ভারতের সবচেয়ে বেশি ধনী রাজ্য ছিলো। এই চল্লিশ

বছরে পশ্চিমবঙ্গের কি হাল হয়েছে তাতো আপনারা নিজের চোখে দেখছেনই। হ্যাঁ। বাঙালীর অনেকেই দোষ আছে। অস্বীকার করব না। তা নিয়ে আলোচনাও করব। কিন্তু বাঙালীর সবই কি দোষ? কোনো গুণই কি নেই? যে দেশ ভাগের জন্যে তারা দায়ী নয়, যে বাংলা ভারতের সব প্রদেশীয়কে জায়গা করে দিতে দিতে, ভাইয়ের মমতায় কোল পাততে পাততে; আজকে শহরতলির বাসিন্দা, ডেলী প্যাসেঞ্জারী করা এক বুভুক্ষু জাতেই পর্যবসিত হয়েছে তার সবটুকু দোষ কি তার নিজেরই একার?

বাংলার পাট-রপ্তানীর শুল্কের ভাগ যখন কমিয়ে দেওয়া হলো তখন পূর্ব পাঞ্জাবের কোনো ক্ষতি হলো না। কারণ পাট পূর্ব-পাঞ্জাবে হতোই না।

স্বাধীনতার পর প্রথম পাঁচ মাস মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তারপর ডঃ বিধান রায় মুখ্যমন্ত্রী হলেন। বিধানবাবু এই ব্যাপার নিয়ে নেহেরু সাহেবকে অনেক বললেন কিন্তু আন্তর্জাতিক মানুষ জওহরলাল, বাগ্মী জওহরলালের; এই অভাগা প্রজাতি নিয়ে ভাবার সময় কোথায় ছিলো?

এই বাগ্মী আর ব্যারিস্টারেরাই কিন্তু দেশের নেতা হয়েছেন মুখ্যতঃ। ঘুরিয়ে বললে বলব, তাঁরা পয়সার জন্যে বক্তৃতা করে করে বক্তৃতাটাই বোধ হয় রপ্ত করে থাকেন খুব ভালো। বক্তৃতার সার সম্বন্ধে ততটা সচেতন হন না। বিধানবাবু এই ব্যাপারে নেহেরু সাহেবের বছরের পর বছর মনোভাব দেখে এবং পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা দেখে এতই ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, ১৯৬১তে তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের কাছে যে "মেমোরাণ্ডাম" বিধানবাবুর নির্দেশে দেওয়া হয়েছিলো তা এই রকম।

"ইন আওয়ার ভিউ ওয়ান অফ দ্যা মেজর টাস্কস্ অব দ্যা ফাইন্যান্স কমিশন উ্যড বি টু অ্যাসেস দ্যা নীডস্ অব দ্য সেণ্টার এ্যাকরডিং টু ফাংশনস ইট ইজ রিকুয়ার্ড টু ডিসচার্জ আণ্ডার দ্যা কনস্টিট্যুওশন এ্যাণ্ড টু এ্যালাও ইট টু রিটেইন সো মাচ্ এ্যাণ্ড সো ম্যাচ্ ওন্‌লি, অব দ্যা ফাণ্ডস দ্যাট আর এ্যাকচুয়ালি রিকোয়ার্ড ফর দ্যা ডিসচার্জ অব দোজ স্পেসিফিক্যালী সেণ্ট্রাল ফাংশনস ইন এ্যান এফিসিয়েণ্ট ম্যানার।"

এরও দশ বছর আগে, প্রথম ফিনান্স কমিশনের কাছে ১৯৫১-তেও পশ্চিমবঙ্গ দরবার করেছিলো। সেই "মেমোরাণ্ডামে" পশ্চিমবঙ্গ একই ভাবে কেন্দ্রকে বলেছিলো যে, কেন্দ্রের রাজস্ব—নীতি কিভাবে পশ্চিমবঙ্গকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাতে, বলা হয়েছিলো, "এ্যান এ্যাটেম্পট টু বীল্ড আ স্ট্রং সেণ্টার অন দ্যা ফাউণ্ডেশন অব উইক স্টেটস্ ইজ লাইক অ্যান অ্যাটেম্পট টু বিল্ড আ স্ট্রং বিল্ডিং অন দ্যা ফাউণ্ডেশন অব স্যাণ্ডস্। স্ট্রেইনথ মীনস ইন দিজ কনটেক্সট, এ্যাবিলিটি টু পারফর্ম এ্যাডেকুয়েটলি অ্যাণ্ড প্রপারলি দ্যা ডিউটিজ অ্যাসাইনড টু ইচ।"

ঐ মেমোরাণ্ডামে পশ্চিমবঙ্গ, কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেমব্লীর এক্সপার্ট কমিটির এ বাবদে যা রেকমেণ্ডশান উদ্ধৃত করেছিলো তাও। বলেছিলো, "দ্যা বেসিক ফাংশনস অব আ ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট আর ডিফেন্স, ফরেইন-অ্যাফেয়ারস্ এ্যাণ্ড দ্যা বাল্ক্ অফ ন্যাশনাল ডেব্ট।"

এক্সপার্ট কমিটি এও বলেছিলেন যে, "দ্যা নীডস অব দ্যা প্রভিন্সেস আর ইন কনট্রাস্ট টু দ্যা নীডস অব দ্যা সেণ্টার ওলমোস্ট আনলিমিটেড, পার্টিকুলারলি ইন রিলেশন টু ওয়েলফেয়ার, সার্ভিসেস এ্যাণ্ড জেনারেল ডেভেলপমেণ্ট।" সেই কমিটি এও বলেছিলেন যে শুধু ব্যক্তিগত আয়করের ভাগই নয়, আয়করের সবচেয়ে মোটা যে ভাগ, কোম্পানীদের দেয় ট্যাক্স (করপরেশান ট্যাক্স) তারও প্রাপ্য হওয়া উচিত রাজ্যের ষাট ভাগ এবং কেন্দ্রর চল্লিশ ভাগ।

যদি কনস্টিটিট্যুয়েন্ট অ্যাসেমব্লীর এক্সপার্ট কমিটির এই মন্তব্য ও রেকমেণ্ডেশান মেনে নেওয়া হতো তবে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আজকের মতো হতো না এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে দয়ার দানের উপর ভরসা করেও থাকতে হতো না আমাদের। স্বাধীনতার আগে দিল্লী যেমন ছিলো আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও তাই। আমরা যেন দিল্লীর-ই দয়ার দানে পুষ্ট এক ভিখিরীর জাত।

বাঙালীর দোষ অনেকই আছে অস্বীকার করবো না কিন্তু আজকে

পশ্চিমবঙ্গের যে অবস্থা তার জন্যে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্যরা, ত্রাণমন্ত্রী পাঞ্জাবের মেহেরচাঁদ খান্না, বাণিজ্য মন্ত্রী মহারাষ্ট্রের মানুভাই শাহ অনেকখানিই দায়ী।

আজও পশ্চিমবঙ্গ থেকে কম কোটি টাকা করপোরেশান ট্যাক্স আদায় হয় না কিন্তু তার সামান্যই পায় পশ্চিমবঙ্গ। যদি ব্যবসা-বাণিজ্য-কারখানার ট্যাক্সের ভাগও আমরা না পাই, যদি আমাদের ছেলে মেয়েরা সেই বিরাট ক্রিয়াকাণ্ডে চাকরীও না পায়, যদি পশ্চিমবঙ্গবাসী ধুঁকতে ধুঁকতে ক্রমাগত কবরের দিকেই ক্রমশঃ এগোতে থাকে তবে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারখানা থাকলো কি না থাকলো তাতে সাধারণ বাঙালীর কি আসে যায়? আর যারা এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেই কোটি কোটি টাকা রোজগার করে, তারাই পশ্চিমবঙ্গের আর বাঙালীদের সবচেয়ে বড় সমালোচক। তাদের সবচেয়ে বড় অপমানকারী।

'জ্যোতিবাবুর' মতো নেতা নাকি হয় না। তাঁরা বলেন। জ্যোতিবাবু যে বিধানবাবুর পরে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় নেতা এ-কথা একশবার স্বীকার করেও বলব বিধানবাবুর মধ্যে বাঙালীদের জন্যে যে দরদ ছিলো জ্যোতিবাবু তাঁর কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে তার কাছাকাছি আসতে পারেননি। বাংলার শিল্পপতি-ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তো তাঁকে ভগবান বলে মানেন তাহলে তিনি তো তাঁদের মুখেও কিছু বলতে পারেন। আইন করে না বললেও। জ্যোতিবাবুর চোখের সামনেই কি এই হতভাগ্য জাত বিরাট ভারতবর্ষ থেকে মুছে যাবে?

ব্রিটিশরা চিরদিনই বাংলাকে দেখতে পারেনি। বাঙালীরা সেনাবাহিনীতে ঢুকতে পারেনি (অফিসার ক্যাডার ছাড়া) কারণ তারা "বিদ্রোহী" জাত। বাংলা ছিলো ব্রিটিশ সরকারের 'চোখের বালি'। স্বাধীন ভারতের সরকারের কাছেও তাই-ই।

এই রাজ্যে সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তা রাজ্যের ভোগে লাগছে না। ১৯৫৬-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফিনান্স কমিশনকে তাঁদের মেমোরাণ্ডামে বলেছিলেন, "দিজ গ্রেট ডিস্প্যারিটি বিটউইন ওয়েলথ এ্যাণ্ড ট্যাক্সেবিলিটি ইজ দ্য বিগেস্ট ট্র্যাজেডি অব

দ্যা স্টেট।" "দিজ ইজ এ্যাট দ্য রুট অব মোস্ট অব দ্যা ম্যালাডি ফ্রম হুইচ্ দ্যা বডি-পলিটিক্ অব দিজ স্টেট সাফার্স। দিজ ইজ দ্যা প্রবলেম পিকুলিয়ার টু ওয়েস্টবেঙ্গল। অ্যাণ্ড ইট ক্যাননট বি সলভড্ উইদাউট গিভিং টু দ্যা স্টেট-গভর্ণমেন্ট এ কমেনস্যুরেট শেয়ার ইন দ্যা ট্যাক্স অন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েলথ এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনকাম্।"

কোথায় ১৯৬৬ আর কোথায় ১৯৮৭। "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।" পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুও কম চেষ্টা করেননি কেন্দ্রকে বোঝাতে। কিন্তু সব অনুরোধ, উপরোধ কেন্দ্র পায়ে ঠেলেছে।

এবারে কি ভয় দেখাবার সময় এসেছে? বাঙালী ব্রিটিশকেও ভয় পায়নি। তখন ভয় পায়নি দেশাত্মবোধের কারণে। আর আজকে তাঁর বাঁচাব প্রশ্ন সামনে। দিল্লী তো ধীরে ধীরে সমস্ত ভারতবর্ষকেই টুকরো করে দেওয়ার পথে এগোচ্ছে। মুখে "ঐক্য ঐক্য" করে চেঁচালে কি হয়? ভিন্দ্রানওয়ালা যদি ভয় দেখাতে পারেন, হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গরই এক বঞ্চিত অংশ যে-বঞ্চনার জন্যে কেন্দ্রই পুরোপুরি দায়ী; সেই দার্জিলিং-এর ঘিসিং যদি চোখ রাঙাতে পারেন; তবে বাঙালীরা কি পারে না?

না। সন্ত্রাসবাদের পথ ঠিক পথ নয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে আমাদের।

কেন্দ্র যদি এই অবিচার চালিয়েই যেতে থাকে তবে সমগ্র পূর্বাঞ্চল এক হয়ে গিয়ে এক আলাদা রাজ্য গড়ার কথা ভাবতে হতে পারে। ভাবতে হতে পারে, এই ব্রিটিশ ডেমোক্র্যাটিক সীসটেম্‌কে ত্যাগ করে আমেরিকান সীসটেমের ফেডারাল গভর্ণমেন্ট করার কথা যেখানে রাজ্যরা অনেক বেশি স্বাধীন সবদিক দিয়ে এবং তাই কেন্দ্রর সঙ্গে সম্পর্ক অনেক মধুর। সমস্ত ভারতবর্ষে যে ভাঙন দেখা দিয়েছে আজ তা বন্ধ করতে হলে সংবিধান সংশোধন করে আমাদের সেইরকম গণতন্ত্রেই যেতে হবে।

জানি, এই তালি-বাজানো মোসাহেবদের দেশে, মেরুদণ্ডহীনদের

দেশে, অমানুষদের দেশে, অসৎদের দেশে তা অত সহজে হবে না। তবে সমস্ত রাজ্যের একই সঙ্গে মিলে এই চেষ্টা করতে হবে ভারতবর্ষকে যদি বাঁচাতে হয়। সাবেকি বাড়িতে থেকে অনেক আপন ভাই যেমন হাঁড়ি আলাদা করে থাকে, যার যেমন সামর্থ্য সে তেমন খায়, কেউ কাউকে কম-বেশি রোজগারের জন্যে ঈর্ষা বা করুণা করলেও খোঁটা দিতে পারে না, জায়ে জায়ে যেমন শীতের দুপুরে একসঙ্গে বসে গল্প করতে করতে সোয়েটার বোনে; তেমনই হবে তখন সম্পর্ক। আলাদা হাঁড়ি হলেও বড় ভাইকে সবাইই বড় বলে মেনে নেয়। বিয়ের সময় তাঁর নামেই চিঠি ছাপা হয়। সেই সম্পর্ক কি এক-হাঁড়িতে থেকে কামড়াকামড়ি করার চেয়ে ভালো নয়? ছোট বৌ এর ভেলপুরী খেতে ইচ্ছে হলে বা ডিস্‌পিরিন কেনার দরকার হলে যদি বড় ভাসুর বা জা-এর কাছে হাত পাততে হয় তখন যেমন অবস্থা হয় এখন আমাদের দেশের সামগ্রিক চেহারাটা সেইরকমই।

আমি বা আপনি তো রাজনীতি করি না। নির্বাচনে দাঁড়াই না। ভোট দিই শুধু। এবার ভোট দেওয়ার আগে যে-দলকেই ভোট দিন বা স্বতন্ত্র প্রার্থীকেই, আপনার প্রার্থীর সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন। রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের অনেক এবং অনেকরকম বক্তৃতাই আপনারা চল্লিশবছর ধরে শুনছেন এবারে আপনারা কিছু বলুন আর ওঁদের শুনতে বলুন। নির্বাচনের আগে বিনয়ের অবতার, মিষ্টি-কথার ফুলঝুরি, পাড়ার ছেলেদের জলসার টাকা-দাতা উদারতা আপনারা অনেক বছর ধরে দেখে আসছেন। এবার স্পষ্ট ভাষায় বলুন যে, কাজ করতে হবে। রাজনীতি, ফোকটে টাকা-কামাবার, ফেরেববাজী করার পেশা নয়। রাজনীতি অনেক বড কাজ। দেশের ও দশের সেবা। আজে-বাজে মানুষদের রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে যদি তাড়াতে পারেন, আপনারা নিজেরাই যদি সাহস করে ভবিষ্যতে দাঁড়ান; তবে দেখবেন শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই নয়, সারা দেশেরই চেহারা পাল্টে যাবে।

বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের মধ্যে অনেকই ভদ্রলোক এবং সৎ লোক আছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু সৎ হলেই হবে না। বাংলার জন্যে

এবারের নির্বাচনের পর কিছু করতে হবে। দয়াপরবশ হয়ে নয়, ন্যূনতম কর্তব্য হিসেবেই। আপনারা ভোটদাতারা এক ঘুমন্ত অজগর হয়ে গত চল্লিশ বছর ঘুমিয়ে ছিলেন। সেই অজগর যখন ঘুম ভেঙে চলতে আরম্ভ করবে তখন দেখবেন সে নিজের গতিতেই, নিজের গন্তব্যেই চলেছে। দেশ আপনাদের। মুষ্টিমেয় নেতাদের নয়। নিজের দেশ, নিজের জন্যে, নিজের সন্তানদের জন্যে নিজের মনোমতো করে গড়ুন। এ দেশ রাজীব গান্ধীর যতটুকু, জ্যোতিবাবুর যতটুকু, যতীনবাবুর যতটুকু, নকশালদের যতটুকু আপনারও ঠিক ততখানিই। আপনারা যাঁদের চাইবেন তাঁরাই ক্ষমতাতে আসবেন কিন্তু নির্বাচনের আগে এবং পরে আপনাদের ভূমিকার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আপনারাই তো দেশ! দেশের সবকিছু। দেশের মানুষই দেশ বানায়। জাপান, জার্মানী, জার্মানীর ইহুদিরা তো শেষই হয়ে গেছিলো প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। যুদ্ধে ব্রিটিশ জয়ী হয়েছিলো অন্যান্যদের সাহায্যে। কিন্তু হারের পর পশ্চিম জার্মানী, জাপান এবং ইজরায়েল প্রমাণ করেছে যে, দেশ হয় দেশের মানুষ দিয়ে। তাদের চরিত্র দিয়ে। অন্য কোনো কিছু দিয়েই নয়। আপনি যে গ্লানির জীবন যাপন করে যাচ্ছেন তাতে ধিক্কার জাগে না মনে? আপনি কি চান না যে, আপনার ছেলেমেয়েরা সুস্থ হয়ে, সুন্দরভাবে, সৎ ভাবে, মানুষের মতো মানুষ হয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচুক নিজের দেশে? আপনার বৃদ্ধ বয়সে সরকার যেন আপনাকে দেখে? আপনার চাকরী চলে গেলে আপনি যেন বেকার ভাতা পান? আপনার অসুখ করলে আপনি যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি হাসপাতালে সাদা ধবধবে বিছানার চাদরে শুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন?

এই সবই ভারতের যা বর্তমান আয় তা থেকেই করা সম্ভব ছিলো। বিভিন্ন পাঁচশালা (অনেকে বলেন, হুস্‌স্ শালা!) পরিকল্পনাতে যে অগ্রগতি হয়নি তা নয়। অনেকই অগ্রগতি হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। দেশের আয়ও বেড়েছে। আমি পৃথিবীর চারটি মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই গেছি। সেই সব দেশের সঙ্গে তুলনা করে দেখেছি। আমাদের

সবচেয়ে বড় সমস্যা কি জানেন ? যে সমস্যার জন্যে ভারত কোনোদিনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তা হচ্ছে জন-সংখ্যা। এই সমস্যাকে গোড়ায় আঘাত দিয়ে এক্ষুনি একে বাগে আনতে না পারলে আপনার তো দূরস্থান, আপনার ছেলেমেয়ের জন্যও নরক অপেক্ষা করে আছে।

সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোলের 'খুড়োর কল' কবিতাতে ওঁরই আঁকা একটি ছবি আছে। খুড়োর মাথা, ঘাড় আর পিঠের সঙ্গে একটি কাঠের তক্তার ফালি বাঁধা এবং সেই ফালিতে পেরেক মেরে আরেকটি ফালি মাথার উপরের থেকে সামনে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ফালিটির প্রান্ত থেকে একটি সুতো ঝুলছে এবং সুতোর তলায় এক টুকরো মাংস। খুড়ো প্রাণপন দৌড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মাংস খাওয়া আর হচ্ছে না। আমাদের দেশের সব পরিকল্পনা, সব অগ্রগতি, সব সম্পদ বেকার হয়ে যাচ্ছে শুধু লম্ফমান জনসংখ্যারই কারণে। খুড়োর মুখ আর খুড়োর সাধের মাংসর টুকরোর মধ্যে ব্যবধান একই থেকে গেছে। অথচ আশ্চর্য লাগে, যখন দেখি' না কেন্দ্রীয় সরকার, না কোনো রাজ্য সরকার ভাবছেন এ নিয়ে। কারণ ; যত বেশি জনসংখ্যা, ততবেশি ভোট, ততবেশি গদা।

রাজনৈতিক নেতাদের ততবেশি ক্ষমতা !

সংবিধান নতুন করে না লিখলেই নয়। সেই সংবিধানে থাকবে কোনো ভারতীয়রই ছুটির বা তিনটির বেশি সন্তান হতে পারবে না।

কী করে তা করা হবে তা আপনাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ঠিক করবেন। কিন্তু করা না হলে আপনার সন্তানদের জীবন ভিখিরির জীবনেরই মতো হবে, ইহুদিদের কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের মতো নির্মম হবে ; পশুর জীবনের চেয়েও খারাপ। আর একটি দিনও নষ্ট করার সময় নেই। জনসংখ্যা সীমিত হতে থাকলে তক্ষুনি আমরা তার সুফল ভোগ করে যেতে পারবো না। কিন্তু কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যেই, আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবদ্দশাতেই তা তারা ভোগ করে যেতে পারবে। প্রত্যেক ভোটদাতার তো সমান বুদ্ধি নেই। নিজের নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে রাজনৈতিক দলেরা তাদের কুবুদ্ধি দিতেও

সবসময়ে প্রস্তুত। এর জন্যে শুধু কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ভারতীয় রাজনৈতিক দল মাত্রই যখন দেশের প্রকৃত স্বার্থ বিসর্জন দিয়েও গদীতে থাকতে চান তখন আপনারা প্রত্যেকে নিজের নিজের কেন্দ্রের প্রার্থীর মাধ্যমে জোর না খাটালে কোনোদিনও এ হবে না। আপনার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ আপনারই হাতে। শুধুমাত্র আপনার নিজেরই হাতে। ভুলে যাবেন না।

প্রথম ফিনান্স কমিশন বলেছিলেন যে, যে রাজ্য থেকে রোজগার যাইই হোক না কেন তার আশী শতাংশ পাবে সব রাজ্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে, বাকি মাত্র ২০ শতাংশ পাবে সেই রাজ্যের আদায়ের উপরে। তখন পশ্চিমবঙ্গ আর বম্বের আয় সবচেয়ে বেশি ছিলো। অথচ উত্তর প্রদেশ পেলো সবচেয়ে বেশি সুযোগ। উত্তর প্রদেশই তো ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বর সিংহভাগ নিয়ে বসেছিলেন গোড়ায় গোড়ায়। সাতটি ফিনান্স কমিশন এই সূত্রের কিছু রদবদল করলেন। রাজ্য পায়, সে রাজ্যে আদায়ীকৃত স্ট্যাম্প ডিউটি, অ্যালকহল আর ওষুধের উপরের একসাইজ ডিউটি। এই সব ট্যাক্স রাজ্যই আদায় করে। কিছু কিছু ট্যাক্স যদিও কেন্দ্র আদায় করে তবে রাজ্যদের তা থেকে কিছু দেওয়া হয়। পার্লামেন্ট যেমন ঠিক করে দেন। যেমন, এস্টেট ডিউটি (বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং তাঁর বাজেটে তা উঠিয়েই দিয়েছেন), টার্মিনাল ট্যাক্সেস, মাল ও যাত্রীর উপরে ধার্য, রেলওয়ের মালের ভাড়ার, যাত্রী ভাড়ার এবং স্টক-এক্সচেঞ্জের লেনদেনের উপরের ট্যাক্স, খবরের কাগজের বিক্রী এবং বিজ্ঞাপনের উপরের ট্যাক্সের কিছুটা, ইনকাম ট্যাক্স, যা কেন্দ্রই আদায় করে তার মধ্যে ব্যক্তিগত করের একটি অংশ রাজ্য পায় নির্ধারিত ভাগ অনুসারে। কিছু কিছু একসাইজ ডিউটি, মিলেদের কাপড়চোপড়ের উপর ধার্য অতিরিক্ত একসাইজ ডিউটির কিছুটা, তামাক চিনির উপরের করেরও কিছুটা। এছাড়া কেন্দ্রর ইচ্ছানুযায়ী “গ্রান্টস-ইন-এইড” দেন কেন্দ্র। রাজ্যদের। ধারও দেন কেন্দ্র। কিন্তু আয়করের আসল যে কোম্পানীদের দেয় কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স, তার সামান্যই পায় রাজ্য। মোট কথা কেন্দ্রই একমাত্র

ব্যক্তিগত আয়করের মোটা অংশ ছাড়া অন্য মূল আয়ের সূত্রগুলির মালিক। তাদের "গ্রান্টস-ইন-এইড" আর "ধারের" উপরই পশ্চিমবঙ্গর মতো রাজ্যকে মূলত নির্ভর করতে হয়। কেন্দ্রর দয়ার উপর।

ব্যক্তিগত আয়করও, যখন পশ্চিমবঙ্গর দরকার সবচেয়ে বেশি ছিলো দেশ ভাগের পরপরই, সবচেয়ে কমিয়ে দিয়েছিলেন এক বাঙালীই। নিয়োগী কমিশন (প্রথম ফিনান্স কমিশন)

	রাজ্যর প্রাপ্য শতাংশ	হিসেবে	
		জনসংখ্যা	আদায়
প্রথম কমিশন	৫৫	৮০	২০
দ্বিতীয় „	৬০	৯০	১০
তৃতীয় „	৬৫	৮০	২০
চতুর্থ „	৭৫	৮০	২০
পঞ্চম „	৭৫	৯০	১০
ষষ্ঠ „	৮০	৯০	১০
সপ্তম „	৮৫	৯০	১০
অষ্টম „	৮৫	৯০	১০

অষ্টম ফিনান্স কমিশানের কাছ থেকে নতুন কিছু পাওয়া যায়নি যদিও বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি দলিলে কেন্দ্রকে বলেছিলেন, অনেক চেষ্টাই করেছিলেন। সাম্প্রতিক অতীতে "দ্যা সেণ্টার-স্টেট রিলেশনস্ আর ক্রুসিয়াল টু দ্যা প্রিসার্ভেশন অব দ্যা ইউনিটি এ্যাণ্ড ইনটিগ্রিটি অব ইণ্ডিয়া উইদিন দ্যা ফ্রেমওয়ার্ক অব ইটস লিঙ্গুইসটিক্, কালচারাল এ্যাণ্ড আদার ডাইভার্সিটিস"। কিন্তু কেন্দ্রর বধির কর্ণে তা প্রবেশ করেনি। হাতে ক্ষমতা যতই কেন্দ্রীভূত থাকবে, যত টাকা থাকবে হাতে; ততই না চোখ-রাঙানো যাবে রাজ্যদের! এবং বিশেষ করে পশ্চিমবাংলাকে! এই চোখ-রাঙানীর ফল যে ক্রমাগত খারাপই হয়ে চলেছে তাতো আপনারাই দেখছেন।

কয়েকটি রাজ্যর জনসংখ্যার হিসেব এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব, উনিশশো একাশীর সেনসাস্ অনুসারে নীচে দেওয়া হলো।

	রাজ্য	জনসংখ্যা	ঘনত্ব
[ক]	উত্তর প্রদেশ	১,১০,৮৬২০১৩	৩৭৭
[খ]	মহারাষ্ট্র	৬২,৭৮৪১৭১	২০৪
[গ]	তামিলনাড়ু	৪৮,৪০৮০৭৭	৩৭২
[ঘ]	পশ্চিমবঙ্গ	৫৪,৫৮০৬৪৭	৬১৫

এবার রাজ্যগুলির রাজধানীর জনসংখ্যা দেখুন

[ক]	এলাহাবাদ	৪,২২৮৪১
[খ]	ম্যাড্রাস	৪,১৮৯৩৪৭
[গ]	বম্বে	৪,২৪৩৪০৫
[ঘ]	কলকাতা	৯,১৯৪০১৮

বুঝতেই পারছেন পশ্চিমবঙ্গের মোট এলাকার তুলনাতে জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং কলকাতার জনসংখ্যা কি প্রকট রূপ ধারণ করেছে। রাজ্যের যে আয়ের অংশ প্রাপ্য তাতে একেবারেই চলে না। টাকা চাইলেই কেন্দ্র দিশি মালিকের মতো ব্যবহার করেন। তবে এই অবস্থায়ও রাজ্যের প্রাপ্য টাকা সব খরচ না করতে পেরে ফেরৎ যায় কি করে তাও ভেবে পাওয়া যায় না। রাজ্যের প্রশাসনের অবস্থা কি এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে? পরের সেন্সাস্ প্রমাণ করবে অবস্থা ভয়ংকর।

শুধুমাত্র ফার্মাসিউটিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজের কথাই যদি বলি তো ১৯৪৮ দেশে দশকোটি টাকামতো টার্ণওভার ছিলো। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই ছিলো আট কোটি। বাকি ভারতে দুকোটি। ১৯৪৮-তে সারা দেশে ১৮০০ কোটি টাকার বিক্রী এই ইণ্ডাস্ট্রীতে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিক্রী তার মধ্যে মাত্র ৫০-৬০ কোটি। দোষটা বাঙালীদের কিছুটা। কিন্তু অনেকখানিই কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মানুভাই শাহর। তিনি মহারাষ্ট্রকে, যেভাবে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যদের বঞ্চনা করে গায়ের জোরে ইণ্ডাস্ট্রী পাইয়ে দিয়েছেন তেমন লজ্জাকর দৃষ্টান্ত বিরল। অর্গানন কোম্পানী,

একমাত্র বহুজাতিক ওষুধের কোম্পানীর ইণ্ডাস্ট্রীয়াল লাইসেন্স পশ্চিমবঙ্গে তিনি দেন। তাও দু-দুবার 'না' করার পর। আসামে ভারতের পেট্রোকেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীর গোড়াপত্তন হয় অথচ আসামকে না দিয়ে পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স তিনি মহারাষ্ট্রকে দেন। ওড়িশাতেও বিজু পট্টনায়েক এবং অন্য দু একজন শিল্প-মালিক এবং জবরদস্ত মানুষের জোরের কারণে সামান্য কটি শিল্প স্থাপিত হয়। নইলে সমস্ত পূর্বাঞ্চলকে সমানভাবেই বঞ্চনা করা হয়।

সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে মহারাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাজ্যর এম. পিরা সঙ্ঘবদ্ধ নিজেদের রাজ্যর কোলে ঝোল টানতে চিরদিনই সোচ্চার ছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গর প্রায় সব এম. পি.-ই বোধহয় বেড়াতেই যেতেন পার্লামেন্টে। রাজ্য সরকারও তাঁদের সব ব্যাপারে ব্রিফ্ করতেন কি না জানা নেই। নাকি, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও প্রধানমন্ত্রীদের ভয়েই এবং নিজের নিজের ভবিষ্যতের কারণেই তাঁরা মেরুদণ্ডহীনের মতো ব্যবহার করতেন? কে জানে? শরৎচন্দ্র বোস ১৯৪৬-এ এবং শ্যামাপ্রসাদবাবু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে ১৯৫০ সালে বিদায় নেবার পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনো সদস্য যে আদৌ পার্লামেন্টে আছেন তা তাঁদের আচরণে বোঝা যায় নি। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য কিছু বলতেন। তবে মমতা ব্যানার্জী সত্যিকারের গণতান্ত্রিক উদাহরণ রেখেছেন কংগ্রেসের এম. পি. হয়েও সরকারী অনেক সিদ্ধান্তর বিরোধীতা করেও। বাংলার জন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

এবার থেকে এমন এম. পি.-ই আপনারা পাঠান যাঁরা শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, সমস্ত দেশের হয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলতে পারেন। যাঁদের কোনো ভয় নেই। গোপন-কথা নেই। মানুষের মতো মানুষদের নির্বাচন করে পাঠান।

বাংলার তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী বন্ধুরা, যারা বাংলার ভবিষ্যৎ, আপনারা মনে করতে পারেন দেশ ভাগের পর বাঙালীর সঙ্গে কেন্দ্র কী দুর্ব্যবহার করেছিলো সেই পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে আজ লাভ কি? লাভ কিছুই নেই। যে ক্ষতি আমাদের হয়েছে দিল্লীর অবিচারের কারণে সেই ক্ষতি পূরণ হবে না। আপনারা সে সম্বন্ধে যাতে অবহিত থাকেন তাইই এই পুরোনো প্রসঙ্গ টেনে আনা। প্রত্যেক প্রজাতিরই তার ইতিহাস, তার দুরাবস্থা, তার অসহায়তার দুর্দশার প্রকৃত কারণ জানা দরকার। যে প্রজাতি নিজের অতীতকে ভুলে যায় তাকে চিরদিনই সকলে লাথি মারে, তাদের সঙ্গে কুকুরের মতো ব্যবহার করে।

যে অন্যায় ১৯৪৭ এর পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে বিধানবাবু এবং জ্যোতিবাবুর মতো সম্মানিত এবং সাহসী নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও, তাঁদের নিরন্তর চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ; সেই অন্যায়েরই 'স্নো-বলিং এফেক্টে'-এ আজ আপনাদের এই অবস্থা। বাবা-মাকে "তোমরা কেন আমাদের পৃথিবীতে এনেছিলে যদি মানুষই না-করতে পারো?" এ কথা বলবার আগে আপনাদের মা-বাবাদের অসহায়তার কথাও আপনাদের জানা কর্তব্য।

দিল্লীতে আমাকে গড়ে মাসে একবার করে যেতে হয় নিজের পেশার কাজে। বিশ্বাস করুন, যখনি দিল্লীতে নামি প্লেন থেকে তখনই আমার চোখ জ্বালা করতে থাকে। আমি আমার দেশের আনাচে কানাচে ঘুরেছি। ওড়িশায় আমি এমন মানুষ দেখেছি যারা একটি গামছাকে দু

ভাগে ভাগ করে একভাগে লজ্জানিবারণ করে অন্যভাগকে একাধারে শীতবস্ত্র, এবং তোয়ালে করে বাঁচে। সেই দেশেরই টিভিতে "ভিমল ওনলী ভিমল" বা "গার্ডেন প্রিন্টস" বা "বম্বে ডাইং" এর শাড়ি পরে যখন বম্বে ফিল্মের কোটিপতি মডেল ও নায়িকারা উপস্থিত হন তখন আমার তাদের কথা মনে হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে তাদের গায়ের চামড়া সাপের খোলসের মতো উঠে যায় পরতের পর পরত কারণ! এরা শীতের রাতে শীতবস্ত্র না থাকায় আগুনের সামনে একবার বুক দিয়ে শোয় আরেকবার পিঠ দিয়ে। এমনি করে করেই তারা "রোস্টেড" হয়ে যায়। তবু তো ওড়িশাতে উদ্বাস্তুর সমস্যা ছিলো না। যে-দেশের প্রথম রাতে সদ্য-প্রসবিনী মাকে স্তম্ভিত করে তার নবজাত শিশুর নরম তুলতুলে মাথার ঘিলু ছুঁচোতে কুরে খেয়ে যায় আমি সেই দেশেরই মানুষ। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর সব মহাদেশের অনেকই দেশে আমি গেছি। যখন পৃথিবীর বর্দ্ধিষ্ণু দেশের হাজার রকম রুচি-সাজানো দোকানের সামনে আমি দাঁড়িয়ে থাকি বোবা হয়ে, যখন একটি আট-বছরের ছেলের স্কিইং আউটফিটের সরঞ্জামের দামের ট্যাগ দেখে মনে মনে যোগ করে দেখি যে তার দাম পনেরো-ষোলো হাজার টাকা, আমাদের টাকায়; যে পোশাক পরের বছরই তারা ফেলে দেবে, যখন দেখি, হাজার হাজার সচল গাড়ি পাহাড়ের মতো স্তূপাকার করে রাখা আছে 'জাংক' হিসেবে, যখন দেখি একবছর-ব্যবহৃত বহুমূল্য সোফা-সেট, কার্পেট 'অক্সফাম্' এ দান করে দিয়ে পরের বছর আবার বহুমূল্য সোফা-সেট কার্পেট এবং তারা কেনে তখন মনে হয় আমার দেশের মানুষের কথা। চোখ জলে ভরে আসে।

বিহারের পালামৌর গ্রামের মানুষেরা, যারা বছরের মধ্যে ছ' মাস কান্দা-গেঁঠি খুঁড়ে খেয়ে, শুকনো মহুয়া চিবিয়ে জানোয়ারের মতো বেঁচে থাকে আমি তাদেরই দেশের লোক। যে দেশের শতকরা আশী ভাগ মানুষ এখনও দুবেলা পেটপুরে খেতে পায় না, অনাহারে, অসহ্য শীতে এবং গ্রীষ্মে, ওলাওঠা এবং বসন্তে এবং অপুষ্টিতে যে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ জানোয়ারের মতো মারা

যায় সে দেশের ডগ্-লাভারস সোসাইটি দেখে যেমন অস্বস্তি বোধ করি তেমনই বোধ করি সেই দেশের রাজধানীর আড়ম্বর ও বড়লোকি দেখে। কত সরল, সোজা, যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত মানুষের চোখের জল, দীর্ঘশ্বাস যে দিল্লীর এবং বম্বের ঝকঝকে পথে ও ফাইভ-স্টার হোটেলের রাজন্যবর্গর প্রাসাদকে ম্লান করা সৌষ্ঠবের মধ্যে আমি দেখতে পাই, শুনতে পাই ; তা আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না। যে দেশের অভ্যন্তরীণ কোনো সমস্যাই মিটলো না চল্লিশ বছরে-মুদ্রাস্ফীতি, বেকার-সমস্যা, খাদ্য-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা, ন্যূনতম-চিকিৎসার সমস্যা সে দেশেরই প্রধানমন্ত্রীরা সকলেই "আন্তর্জাতিক" ব্যক্তি। দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যর বিরুদ্ধে যখন তাঁরা জ্বালাময়ী ভাষায় পৃথিবীর সব দেশের টি ভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন, কোটি কোটি টাকা দান করেন ; তখন সেই দেশেরই অভ্যন্তরে হরিজন বস্তাতে আগুন লাগে, হরিজন মেয়েরা গণধর্ষিত হয়। এই আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়েই আমাদের যত গোলমাল এদিকে শুনতে পাই যে, আমরা "সোস্যালিস্ট" দেশ। রাশিয়ার বা চীনের নেতারা কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব নন। আজকে হয়তো হয়েছেন। এতবছর ছিলেন না। তাঁরা নীরবে কাজ করেছেন। দেশের প্রত্যেক লোককে কাজ করতে বলেছেন। নিজেদের ঘরের সমস্যা যতদিন না মেটাতে পেরেছেন ততদিন এইরকম বাহ্যিক আড়ম্বরে তাঁরা কখনও মাতেননি। পঁচাত্তরে আমি জাপানে গেছিলাম। তখন একজন জাপানী শ্রমিকের ন্যূনতম দিন-মাইনে ছিলো আমাদের টাকাতে সাড়ে তিনশো। যে-জাপান যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে গেছিলো একেবারেই সেখানে। ছিয়াশীতে দ্বিতীয়বার পশ্চিম জার্মানীতে গিয়ে দেখলাম জার্মান মার্কস্ এর দাম ডলারের চেয়েও বেশি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়লোক দেশ এখন পশ্চিম জার্মানী। জার্মানীর কী অবস্থা হয়েছিলো যুদ্ধের পর তা আপনারা সকলেই জানেন। ওদের সাফল্যর চাবিকাঠি কি জানেন ? বেশি কিছু নয়। প্রথম হচ্ছে ওদের জনসংখ্যা। যা অতি সীমিত। দ্বিতীয় হচ্ছে ওদের পরিশ্রম। ওদের নেতাদের পরিশ্রম।

ওদের ভোটদাতাদের সচেতনতা। উনআশীতে যখন পূর্ব-আফ্রিকাতে যাই তখন মনে হয়েছিলো, যেন ভারতবর্ষেই এসেছি। পায়ে টায়ার-সোলের চটি পরা, কৌপীন-পরা, চোখে দড়ি-দিয়ে বাঁধা চশমা-পরা গরীব আফ্রিকাবাসী যখন ঘোলাটে চোখে আমার চোখে তাকাতো তখনও আমার নিজের দেশের কথা মনে পড়তো। ওদের শোষক গুজরাটি ব্যবসাদারেরা আর উৎকোচ-গ্রহণ করা মুষ্টিমেয় ওদেরই কিছু জাত ভাই। ডার্-এস-সালাম্ শহর দেখে বা নাইরোবি দেখে আপনি পূর্ব আফ্রিকার সাধারণ মানুষের দুঃখের কোনো ধারণাই করতে পারবেন না। কিন্তু ভারত তো পূর্ব-আফ্রিকা নয়। আমাদের কোন্ সম্পদ নেই? তাছাড়া আমরা চল্লিশ বছর স্বাধীন হয়েছি। আজও কেন এই বৈষম্য, এই ডাবল-স্ট্যাণ্ডার্ড থাকবে দেশে? জনসংখ্যা অবিলম্বে সীমিত করে ফেলে ওঁদের কাজের সুযোগ দিলে সকলে কাজ করে দেখিয়ে দেবেন যে আমরাও আমাদের দেশকে পশ্চিম জার্মানী অথবা জাপানের মতো করে তুলতে পারি। এই ভোট-চোরাদের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর দায়িত্ব প্রত্যেকে নিজেদের সবল হাতে তুলে নিন এবারে। আমরা নিজেদের অপদার্থ প্রমাণ করেছি। আমাদের মুখে আপনারা থুথু দিন। কিন্তু নিজেদের অমন করুণার জীবনে, অপমানের জীবনে, অসহায়তার জীবনে বেঁধে রাখবেন না। ভুলে যাবেন না একটাই জীবন। একটা মাত্র। মানুষের মতো বাঁচুন। প্রতিবাদ করুন, প্রতিকার করুন, চোরের উপর রাগ করে আমাদের মতো মাটিতে ভাত খাবেন না আপনারা।

সাতচল্লিশে যখন স্বাধীনতা এলো তার আগেই নেতাজী সুভাষ বোসকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। স্বাধীনতার পর সামান্য কিছুদিন কে. সি. নিয়োগী কেন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন তারপর আর স্বল্প কিছুদিন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। সেই শ্যামাপ্রসাদকে জেলে মরতে হয়েছিলো। কাশ্মীরের জেলে। তাঁর মৃত্যু এখনও রহস্যাবৃত। শরৎ বসুও মারা যান। তারপরে কেন্দ্রে যে সব বাঙালী মন্ত্রী হয়েছেন তাঁদের অধিকাংশরই বাংলার জন্যে কিছুমাত্র করার ইচ্ছা বা সাহস

ছিলো না। গদী পেয়েই তাঁরা খুশি ছিলেন। আজকের মন্ত্রীদের বেলাও সেই কথাই খাটে যদি না তাঁরা অন্য প্রমাণ দেন।

. বাণিজ্য-মন্ত্রী মানুভাই শাহ মহারাষ্ট্র আর গুজরাটকে একা হাতে যা মদত দিয়েছিলেন, আমাদের বাণিজ্য দপ্তরের নতুন রাষ্ট্রমন্ত্রী, তার যদি কিছুটাও করে দেখান বাংলার জন্যে, যদি রাজ্যে কংগ্রেসী সরকার নাও গঠিত হয় তবুও, তবে বুঝবো তিনি অন্য ধাঁচের মানুষ। এখন কেন্দ্রের তথ্য-মন্ত্রী একজন বাঙালী। তাঁর সময়েই টি-ভিকে পুরোপুরি কেন্দ্রীয় প্রচারের যন্ত্র বানানো হলো। তাঁর কাছে কংগ্রেস বা দলপতির নেকনজরে থাকার চেয়ে ও আত্মসম্মান, শুভবোধ, বাংলার এবং সাধারণভাবে দেশের গণতান্ত্রিক ভাবধারার সুস্থ ও সুষ্ঠু প্রতিপালন কি বড় নয়? আমি একবার যুক্তরাষ্ট্রে এবং আরেকবার যুক্তরাজ্যে নির্বাচনের ঠিক মুখোমুখি সময়ে ছিলাম। প্রকৃত গণতন্ত্রে সমস্ত দলই টি.ভির মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য রাখার সমান সুবিধে পান তা তাঁরা সত্য আশ্বাসই দিন বা মিথ্যে আশ্বাস। গণমাধ্যমগুলির একচেটিয়া অধিকার পুরোপুরি কম্যুনিস্ট দেশেই থাকে শুধু। কোনো সুস্থ গণতন্ত্রে নয়।

দেশ ভাগ তো হলো। সকলে বলে পাঞ্জাবীরা কী করিৎ-কর্মা। বাঙালীগুলো আজও কেঁদে বেড়াচ্ছে, ভিক্ষে চেয়ে বেড়াচ্ছে আর পাঞ্জাবীরা কী না করলো!

বাঙালী উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্তরাও একধরনের জীবনে অভ্যস্ত ছিলো। তাঁদের সামান্য কিছুকে রিলিফ-ক্যাম্পে রাখা হয়েছিলো। যাঁরা সাহায্য চেয়েছিলেন। বেশির ভাগই আত্মসম্মানের কারণে সাহায্য চাননি। 'আত্মসম্মান' ব্যাপারটা, বাঙালীর চিরদিনই একটু অন্যরকম ছিলো, যা শুধুই টাকা আর বস্তুবাদে বিশ্বাসী অনেকই ভিন্ন প্রদেশীয়র পক্ষে ভাবা পর্যন্ত সম্ভব ছিলো না। বাঙালীর 'গুমোর' ছিলো। 'গুমোর' শীর্ষক একটি গল্পও আমি লিখেছিলাম যেটি টি. ভি.-তে সাতাশীর মার্চ মাসের দুই সোমবার 'সম্পর্ক' সীরিয়ালে কলকাতা দূরদর্শনে দেখানো হয়েছে। গরীব, দুর্দশাগ্রস্থ বাঙালীর

গুমোর এখনও আছে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তা খুবই খারাপ। অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে তা আবার গর্বেরও। বাঙালী এক আশ্চর্যরকম পরস্পর-বিরোধী সত্তাতে ভরা জাত। কিছুটা মিল আছে মানসিকতায় মারাঠীদের, ওড়িয়াদের আর অসমিয়াদের সঙ্গে। তাঁরা হয়তো বুঝলেও ব'ঙালীকে বুঝতে পারেন।

উদ্বাস্তুরা পুঁজি নিঃশেষ করে, নিজেদের নিঃশেষ করে শেষই হয়ে গেছিলেন। কেউ কেউ, মধ্যবিত্ত আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। এতে পশ্চিমবঙ্গর অর্থনৈতিক কাঠামোও একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিলো। বাঙালীর যেটুকু পুঁজিও বা ছিলো তাও এমনি করেই শেষ হয়ে গেলো সে পূব-বাংলার লোকেরই হোক বা পশ্চিমবাংলার লোকেরই হোক। সেইদিন যে বাঙালীর কোমর ভেঙ্গে দেওয়া হ'লো আজও তা মেরামত হয়নি। এই সত্যি কথাটা ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা আজও স্বীকার করেন না। বাঙালী তাঁদের কাছে এক করুণার জাত। ঠাট্টার বস্তু।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আসা ১৯৪৯এই শেষ হয়ে গেছিলো। কিন্তু পূব পাকিস্তান থেকে ১৯৪৮ অবধি উদ্বাস্তুরা আসে। তারা পশ্চিম বাংলা, আসাম এবং ত্রিপুরাতে কোনোক্রমে মাথা গুঁজে থাকে। ১৯৪৮ এ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের মোট সংখ্যা ছিলো ৪৭·৭০ লক্ষ। পূব বাংলা থেকে ৪১·১৭ লক্ষ উদ্বাস্তু আসে ১৯৫৬ অবধিই। তাও এ সংখ্যা যাঁরা চেকপোস্টে নাম রেজিস্ট্রী করে আসেন তাঁদের সংখ্যা। অনেকেই গুমোরের কারণে এবং অন্য পথে আসাতে নাম রেজিস্ট্রী করেননি। সেই নথীকৃত সংখ্যাই ১৯৪৮ এ বেড়ে দাঁড়ালো ৫২·১৪ লক্ষ। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন "দ্যা স্টোরী অফ রি-হ্যাবিলিটেশান" বলে। সেই পুস্তিকাতেও তাঁরা স্বীকার করেছেন যে "ইল্লিসিট ইমিগ্রাণ্টস্"এর সংখ্যা ছিলো অসীম। বিরাট সীমানা দিয়ে 'মান-প্রাণ' বাঁচিয়ে কে যে কিভাবে এসেছিলেন তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। পাকিস্তানের অ্যাটম-বম্ বানানো বিজ্ঞানী, উদ্বাস্তু হয়ে আসার সময় উত্তর ভারতের

হিন্দু পুলিশের ব্যবহারের তিক্ত স্মৃতির কথা সেদিন বলেছেন। বলেছেন যে সেদিন থেকেই তিনি হিন্দু-বিদ্বেষী। এই বাংলার মানুষদেরও কম নিগৃহীত হতে হয়নি, কম অপমান অসম্মান সইতে হয়নি এই সীমানায় পৌঁছবার আগে। কিন্তু বাঙালী উদার জাত, ক্ষীণ স্মৃতি-শক্তির জাত, ধর্মান্ধও তাঁদের বলা যায় না, তাই তাঁরা ভুলেই গেছেন সেসব দিনের কথা। বাংলাদেশ হবার পর তো বাঙলাদেশী সকলকেই আমরা বুকে জড়িয়েই নিয়েছি। কোনোরকম ভিন্ন ব্যবহার করিনি। এইই হচ্ছে বাঙালীর গুণ। এবং যেটা গুণ, সেটাই অনেকের চোখে দোষ।

পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা ১৯৪৭ এর পঁচিশ বছরের মধ্যেই তাদের আগের মূল অবস্থা থেকেও অনেক স্বচ্ছল হয়ে গেল। না, পাঞ্জাবীরা কাজ করে আর বাঙালীরা অপদার্থ এ জন্মেই নয়। অন্য অনেক কারণ ছিলো।

"ফোনিক্স্ লাইক দ্যা ডিসপ্লেসড পাঞ্জাবী ফার্মার হ্যাজ রাইজেন আউট অফ্ দ্যা অ্যাশেস"—গভর্ণমেন্ট অফ পাঞ্জাবের এম. এস. রান্ধাওয়া ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বলেছিলেন। পাঞ্জাবীরা কাজের আর বাঙালীরা অপদার্থ এমন অপবাদ সেদিন থেকেই হতভাগ্য বাঙালী জাতের উপর চাপিয়ে দিয়ে আসা হয়েছিলো। আমরাও অনেকে তো এসব না জানার আগে অবধি তাইই বিশ্বাস করতাম। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের, মুসলমানদের ছেড়ে-যাওয়া বাড়ি ঘর, ক্ষেত খামার এমন কি ব্যাঙ্কের লকারের টাকা পর্যন্ত দিয়ে দেওয়া হয়। ওঁরা অনেকেই মিথ্যা দাবীও করেন। তার প্রমাণ পুনর্বাসন দপ্তরের দলিল। ১৯৬২তে 'ডিসপ্লেসড পার্সনস ইন দিল্লীতে' বলা হয় ৬০,০০০ লোক ক্ষতিপূরণের দাবী জানায় অথচ ৯৮,০০০ লোককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। তার মানে, নামে বেনামে মিথ্যে দাবী করেন তাঁরা। বাঙালীকে তো একপয়সাও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। রিলিফ-ক্যাম্পে যাঁরা থাকতেন তাঁদের অতি সামান্য "অনুদান" দেওয়া হতো। ক্ষতিপূরণ কাউকেই দেওয়া হয়নি। যদি হতোও তো বাঙালীরা মিথ্যের

বেসাতিতে পাঞ্জাবীদের মতো অতখানি দড় হয়ে ঐ কর্ম করতে পারতেন না। শুধুমাত্র দিল্লীতেই ১৪৫০০ ছেড়ে যাওয়া বাড়ি, দোকান ও ব্যবসা দেওয়া হয়েছিলো তাদের। তাছাড়া ১৪৫০০ একর চমৎকার চাষযোগ্য জমি। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার ষাট কোটি টাকা খরচ করে (তখনকার দিনের ষাট কোটি টাকা!) বাড়ি, বাজার-দোকান, ইত্যাদি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাঙালীদের, যারা চেয়েছিলো; কিছু "ধার" দেওয়া হযেছিলো শুধু। তাও সুদের বিনিময়ে। নইলে এক পাই পয়সাও কেন্দ্র খরচ করেনি বাঙালী উদ্বাস্তদের জন্য। এর উপরে কেন্দ্রীয় সরকারের খরচে উনিশটি টাউনশিপ তৈরী করে দেওয়া হয়েছিলো, "স্টোবী অফ বিহ্যাবিলিট্যাশান"এ গর্ব করে বলা হয়েছে ঐ সব টাউনশিপ সম্বন্ধে যে "আ কমপ্লিট অ্যাণ্ড ভায়াবল্ উইনিট ইকুইপপড্ উইথ স্কুলস, হসপিটালস্ শপিং সেন্টাবস, অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাইট।"

পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুরা যে কি পরিমাণ তঞ্চকতা এর উপরেও করেছিলেন তার প্রমাণ স্বয়ং পার্লামেন্টের এস্টিমেট কমিটির রির্পোটে আছে (১৯৫৯-৬০)। ওঁরা বললেন যে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয়েছে এবং সেই জন্যে ৫০০০০ দরখাস্ত নতুন করে খতিয়ে দেখতে হবে। কীপ্রকার ফোলানো ফাঁপানো হয়েছিলো সেই সব ক্ষতিপূরণের দাবী তা বোঝা যাবে এই থেকে যে ১৩১১৯৫টি পরিবার দাবী করেছিলেন এক লাখেরও বেশি টাকা। যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৯৪৩০০০টি পরিবার এসেছিলেন তার মধ্যে ৭·২টি পরিবারের মধ্যে একটি করে পরিবারই লাখপতি হয়ে গেছিলেন। চল্লিশ শতকের শেষে কী পঞ্চাশের দশকের লাখ টাকার কী দাম ছিলো আপনারা বুঝতেই পারছেন!

শুধুই যে শিল্পোন্নত অঞ্চলে উপনগরী করে দেওয়া হয়েছিলো তাইই নয়। তাঁদের কাঁচা মাল, ক্যাপিটাল, ইকুইপমেণ্ট, প্রায়রিটি বেসিস্ এ দেওয়া হয়েছিলো। ২০২,০০০ পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে চাকরী পেয়েছিলেন ১৯৬০ এর মধ্যে। কেন্দ্রীয়

সরকার, বহু মন্ত্রক এবং বিভাগে ; পাবলিক আণ্ডারটেকিংএ ; সার্কুলার দিয়েছিলেন যে পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের চাকরী দাও।

আর বাঙালীদের? পুনর্বাসন দপ্তরের ১৯৬৪-৬৫র রিপোর্ট অনুসারেই দেখা যাচ্ছে মাত্র ২০৪ জনকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে চাকরী দেওয়া হয়েছিলো। কোনো সমীক্ষাতে বলা হয়নি এই ২০৪ জনের মধ্যে কজনকে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরী দেওয়া হয়েছিলো। এ ছাড়াও পাঞ্জাব হরিয়ানা থেকে অসংখ্য মানুষকে প্রতিরক্ষা বিভাগে চাকরী দেওয়া হয়েছিলো। ব্রিটিশরা বাঙালীদের 'মার্শাল রেস' এর মধ্যে ধরেনি তাই স্বাধীন ভারতের সরকারও সেই নীতিই অনুসরণ করে গেলেন। বাঙালাদের এক একর জমি চাষ করবার জন্যে, সে আন্দামানেই হোক কী দণ্ডকারণ্যেই হোক তিনশ টাকা করে দেওয়া হয়েছিলো। থোক নয়। কিস্তিতে। ধার হিসেবে, সুদের বিনিময়ে। কী অন্যায় অবিচার! এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ-এর মাধ্যমে আজও ক'জন বাঙালী চাকরী পান? এই পশ্চিমবঙ্গেও?

বামফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দিলেন যখন কেন্দ্রীয় সরকার নভেম্বর ১৯৬৭তে তখন প্যারা-মিলিটারী, সি. আর. পি. বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে ভরে দেওয়া হলো এই হতভাগ্য রাজ্যকে। জনগণ-নির্বাচিত সরকারকে অন্যায় করে ভেঙ্গে দিলেন তাঁরা। কিন্তু প্রেসিডেন্টস্ রুল চলাকালীন রাজ্যর অন্যান্য সমস্যাও তো কেন্দ্রেরই সমাধান করার কথা ছিলো। প্রেসিডেন্টস্ রুল জারীর পর ছ' সপ্তাহ কেটে গেলো। একমাত্র সেই সময়ই বাংলার এম. পি.রা পার্লামেন্টে প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে বাংলার হয়ে একজোট হয়ে লড়েছিলেন। অশোক সেন (কংগ্রেস), শার্দা মুখার্জী, (কংগ্রেস) সমর গুহ (পি. এস. পি.), হীরেন মুখার্জী (সি. পি. আই.), জ্যোতির্ময় বসু (সি. পি. এম.), দেবেন সেন (এস. এস. পি.) এবং ত্রিদিব চৌধুরী (আর. এস. পি.) মিলে এককণ্ঠে বললেন : "পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য করো, তার অর্থ নৈতিক অবস্থা, বেকার-সমস্যা ইত্যাদি ওখনও তুঙ্গে"। সমর গুহ বলেছিলেন যে, "ক্যালকাটা অ্যাণ্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ওঅ্যার রাইপ ফর অ্যান

একপ্লোশান।" ত্রিদিব চৌধুরী বলেছিলেন, "ইউ আর কনফ্রণ্টেড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল উইথ নাথিং শর্ট অফ আ রেভুল্যশান।" তেমন দিন কি আবার আসবে? যখন দলমত-নির্বিশেষে সব এম. পি. একজোট হবেন বাংলার হয়ে?

রেভুল্যশান? ফুঃ। এখনকার বাঙালীরা, আমরা হচ্ছি সোডার বোতলের জাত। ছিপি খোলা মাত্রই কিছুক্ষণ ভুসস্—ভুসস্। তার পর একটু বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি। তারপরই চুপ। বাঙালীর মতো ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির, আত্মবিস্মৃত, একতাহীন, মেরুদণ্ডহীন অবিসংবাদী নেতৃত্বহীন জাত যে নেই তা কেন্দ্র স্বাধীনতার পর থেকেই বুঝে নিয়ে তাদের যে নীতি তা সমানে অনুসরণ করে যাচ্ছে।

বাংলার কি হবে না হবে তা এবার আপনারাই ঠিক করবেন।

যা সবচেয়ে অপমানের এবং গ্লানির এবং ক্ষোভের বলে মনে হয় তা হচ্ছে আজ অবধি বাংলার প্রতি দিল্লীর নবাবদের মনোভাব পাল্টালো না। বাঙালীর আজকের এই অবস্থার জন্যে কেন্দ্র যে অনেকখানিই দায়ী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

ব্যারিস্টার, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ছেলে জওহরলাল নেহরু, যিনি উদার, যিনি দার্শনিক, যিনি স্বপ্ন-দেখা-পুরুষ, বাঙালীদের জন্যে কোনোদিনও তেমন কিছু করেননি প্রধানমন্ত্রী।

মুখে এই পরিবারের সকলেই বাঙালীর সাহিত্য, সংস্কৃতিকে উপরে উপরে প্রশংসা করেছেন। আসলে নয়। ভালোবাসা যে সত্যিকারের নয় তার প্রমাণ একটি দিতে পারি। বিশ্বভারতীর উপাচার্য চিরদিনই ছিলেন এই পরিবারের মানুষেরাই। কিন্তু রাজীব ছাড়া অন্যরা কি করেছেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর জন্যে? রাজীবও যতটুকু করেছেন তা নিমাইসাধন বসুর মতো নিবেদিত-প্রাণ, নাছোড়বান্দা, একরোখা কাজের মানুষের জন্যেই হয়তো। এবং কিছুটা হয়তো ইন্দিরার প্রতি নিমাইবাবুর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার কারণেও। তবু, রাজীবই কিছু করতে রাজী হয়েছেন। আর কেউই আগে করেননি। এইসব নানা

কারণেই আমি আবারও বলছি রাজীব হয়তো ঐ পরিবারের একজন ব্যতিক্রমী মানুষ। তাঁর তারুণ্যও আরেকটি কারণ হয়তো। জানি না, ভবিষ্যৎই জানে। ভবিষ্যতের রাজীব এবং ভবিষ্যতের বাংলা।

উত্তর ভারতের অন্য অনেকেরই চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সুভাষচন্দ্র বোসকে অপছন্দ ছিলো। তাঁদের সহ্য করতে পারতেন না। আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় যে স্বাধীনতার পর থেকেই যেহেতু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে স্বল্প-মেয়াদের জন্যে শ্যামাপ্রসাদ. মুখার্জী ছাড়া আর কোনো প্রণিধান-যোগ্য নেতা ছিলেন না, বাংলাকে প্রথম দিন থেকে এই নারকীয় অবস্থায় ঠেলে দেওয়ার এক গভীর চক্রান্তেই তাঁরা লিপ্ত হয়েছিলেন। পৈশাচিক আনন্দ পেয়েছেন তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান শরিকের এমন দুরবস্থা ঘটিয়ে স্বাধীনতা পাওয়ার পরদিন থেকেই।

নেহেরুর কাছে কলকাতা ছিলো "দুঃস্বপ্নের নগরী"। মিছিল আর শোভাযাত্রার নগরী। জওহরলালের সময় এই শহরে মিছিল আর শোভাযাত্রার প্রয়োজন ছিলো। শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে তখন আজকের চেয়ে অনেকই বেশি নৈরাজ্য ছিলো। অনেক বেশি অত্যাচারিত ছিলো শ্রমিকরা। চা ও পাট শিল্পে শ্রমিকদের মজুরী বাড়িয়ে দিতে পেরে বামপন্থীরা সাধারণ মানুষের সেদিন সত্যিই মস্ত উপকার করেছিলেন। আজকের বাংলার যা অবস্থা তাতে মিছিল করে কিছু হবে না। এই সব মিছিলে, সাধারণ মানুষেরই অসুবিধা হয় বেশি। তাছাড়া একথাও বলব যে, বামপন্থীরা অনেকই সময় তাঁদের ইজম্ এর জন্যে যতখানি করেছেন ততখানি শ্রমিকদের ভালোর জন্যে করেন না। শ্রমিকদের ভালোর জন্যে তাঁরা আনন্দবাজারের মতো এবং আরও নানা সংস্থায় অন্যায় ধর্মঘট ডাকেন কেন? আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী, তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শ যাইই থাক না কেন, বাংলার অন্যতম গর্ব। তাঁরা তাঁদের কর্মীদের যেরকম মাইনে ও সুযোগসুবিধা দেন, যেরকম-ভাবে তাঁদের দেখেন, অন্য বহু বাঙালী-অবাঙালী শিল্পপতিকে আমি চিনি জানি বলেই বলব যে; তাঁদের মতো মালিক দেশে অনেক থাকলে শ্রমিকদের ভালো ছাড়া খারাপ হতো না।

অন্য মতাদর্শ তো থাকতেই পারে। নাহলে আর গণতন্ত্র কি হলো? রাশিয়া বা চীনের মতো টোটাল-কমিউনিজমই চালু করতে হয় তাহলে। স্বাধীনতা ছাড়া মানুষের পক্ষে বাঁচা না-বাঁচা সমান। চিড়িয়াখানার বাঘের চেয়ে বনের বেড়াল হয়ে বাঁচা অনেকই শ্রেয়। আনন্দবাজারের বা স্টেটসম্যানের, বা বর্তমানের, বা আজকালের, বা যুগান্তরের বা গণশক্তির রাজনৈতিক মতাদর্শ নিজের নিজের। গণতন্ত্রে জিততে হলে ফল দেখিয়ে, আন্তরিকতাতেই জিততে হয়। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিছিল করে ভয় দেখানো কংগ্রেস বা বামফ্রন্ট কারোই উচিত তো নয়ই বরং বর্জনীয়ই। এসব করলে আজকাল কেউই ভয় পায় না। বরং বিরক্তই হয়। যা করবার জন্যে ঐসব ক্রিয়াকাণ্ড তার উল্টো ফল হয়। ভোটদাতা মানুষ চল্লিশ বছর আগের মতো এখনও "ডেজড্" অবস্থাতে নেই। সব রাজনৈতিক দলের "ধোঁকাবাজী"ই তাদের চোখে আস্তে আস্তে কমবেশী প্রকট হয়ে উঠেছে।

প্রত্যেককে কাজ করতে বলতে হবে সব দলকেই। দেশের অন্য কোটি কোটি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সেই বিশেষ ব্যবসা বা পেশার কোনো কারখানা বা ব্যবসার মালিকরা বা পেশাদারেরা তাঁদের কর্মচারীদের তাঁদের ব্যবসা বা পেশা বন্ধ না করে দিতে হয় এমন অবস্থা না করে, কর্মচারীদের দেখছেন কি দেখছেন না তা সুস্থ মস্তিষ্কে এবং ন্যায় ও পারিপার্শ্বিক বিচার করেই তাঁদের স্থির করা উচিত। তবে একথাও বলব যে, সব মালিকই আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ নন। যাঁদের পয়সা আছে, তাঁদের অনেকেই গুণ ব্যতিরেকেই আরও পয়সা চান। বেশি পয়সার মালিক হয়ে গেলে অনেকেই অমানুষ হয়ে ওঠে। 'বেশি ক্ষমতার মালিক হলেও। মানুষ যখন অমানুষ হয়ে ওঠে তখন তাকে চোখ রাঙানো বা তার কলার চেপে ধরা ছাড়া উপায় থাকে না। চোরেরা ধর্মের কাহিনী শোনে না। কিন্তু আনন্দবাজারের শেষ ধর্মঘট এবং যাঁরা যোগদানেচ্ছু কর্মী তাঁদের জোর করে বাধা দেওয়াতে বামফ্রন্টের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেনি। তবে জ্যোতিবাবু সবসময়েই

সমঝোতা এবং এই রাজ্যের সার্বিক ভালো দেখার চেষ্টা করেন। বিধানবাবুর পর জ্যোতিবাবুর মতো এমন নেতা বাংলা আর পায়নি যে একথা স্বীকার নিশ্চয়ই করব। জ্যোতিবাবু যেমন আমাদের গর্ব, তেমন তাঁর মন্ত্রীসভাতেই কিছু কলঙ্কও আছেন। পার্টি-সিস্টেম-এর এইই অসুবিধা। দলের কাছে ব্যক্তিকে মাথা নোয়াতেই হয়। যা-কিছুকেই দলনেতার ব্যক্তিগত মত বলে আমরা মনে করি তার হয়তো বেশিটুকুই তাঁর দলীয় মত। ব্যক্তি চাপা পড়ে মরে দলের কাছে তাইই গণতন্ত্রে আমরা সব সময়ই "গভর্নমেন্ট অফ কোয়ানটিটি"ই পাই।

যে-নেহরু কলকাতাকে 'দুঃস্বপ্নের নগরী' বলেছিলেন তাঁর নাতি রাজীব যে সেই কলকাতার কুৎসাই করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? বাঙালীর স্মৃতিশক্তি বড়ই দুর্বল। নইলে রাজীবের কটূক্তি নিয়ে আলোচনা করার সময় তাঁর মাতামহ কি বলেছিলেন তা অনেকেরই মনে পড়ার কথা ছিলো। কিন্তু "অপদার্থ," "অকেজো," "ভেতো-বাঙালীর" এই বর্তমান দুরবস্থা এবং রাজ্যর রাজধানীরও যে তাই, সে জন্যে পরোক্ষে তাঁরাই যে দায়ী একথা কি তাঁরা জানেন না?

রাজীবের দয়ার দানে বাঙালীর আর দরকার নেই। কেন্দ্রের দয়াও নয়। পশ্চিমবঙ্গকে চল্লিশ বছর ধরে শুধু বঞ্চনাই নয়—অপমান, অসম্মান, সবরকমের হেনস্থাও করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গর নির্বাচিত সরকার যে দলেরই হোন না কেন এবারে পশ্চিমবঙ্গর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি আপৎকালীন-জরুরীভাবে এই রাজ্য সম্বন্ধে কিছু না করেন তবে বাঙালী ভোটদাতাদের কাছে তাঁদের জবাবদিহি করতে হবেই।

চাকরী নেই, ব্যবসা আরম্ভ করার সামান্যতম পুঁজিও নেই। পানের দোকান করতেও কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা লাগে। তাছাড়া দোকানই বা পাবেন কোথায়? অবাঙালী ব্যবসায়ীরা যা "পাগড়ী" বা "সেলামি" দেবেন তা কি আপনারা দিতে পারবেন দোকানের জন্যে? মেয়েরা পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, শেয়ালদা বা হাওড়া স্টেশানে ট্রেন থেকে নেমে, গঙ্গায় ফেরি পেরিয়ে, কিংবা বাসে বা ট্রামে চড়তে না

পেরে, অসহ্য ভ্যাপসা গরমে বা শ্রাবণের ভরা বৃষ্টিতে বহু পথ হেঁটে অফিসে পৌঁছনো যে কী প্রাণান্তকর অবস্থা তা ডেইলি-প্যাসেঞ্জারমাত্রই জানেন। ফেরার সময়ও সেই একই দুর্ভোগ। এমন অনেকই বাঙালী অফিস যাত্রী আছেন যাঁরা ভোর ছটা থেকে সাতটাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার রাত আটটা-নটাতে বাড়ি ফেরেন। যানবাহনের অবস্থা, রেলশুদ্ধু; সারা রাজ্যেই অসহ্য অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

বম্বে দিল্লী মাড্রাসের সঙ্গে যখন কলকাতার তুলনা করা হয়, মহারাষ্ট্র, দিল্লী, হরিয়ানা, পাঞ্জাবের বা তামিলনাড়ুর সঙ্গে যখন পশ্চিমবঙ্গর তুলনা করা হয় তখন এই অবর্ণনীয় অবস্থার কথা কেউই ভাবেন না। বম্বের "চার্চগেট" স্টেশানের সামনে নটা থেকে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যাবে ঝাঁকে-ঝাঁকে সুবেশ যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে অফিসের দিকে যাচ্ছেন। বম্বের সাধারণ ট্রেনেও ভীড় কম থাকে না। যেমন, ভীড় কম থাকে না লানডান, বা প্যারিস, বা ন্যুইয়র্ক বা টরোণ্টো বা টোকিওর টিউব ট্রেনেও। কিন্তু ভীড়েরও একটা রকম আছে। যাত্রীদের চেহারা ও পোষাক দেখে, তাঁদের মুখের অবস্থা দেখেই বোঝা যায় যে, তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন। কলকাতায় আসা-যাওয়া-করা যাত্রীদের মধ্যে অবাঙালীও কিছু কম থাকেন না। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালীদের মুখের দিকে চেয়ে দেখি, তাঁদের পোশাকের দিকে চেয়ে দেখি; মেয়েদের শাড়ির দিকে; শুধু বাঙালী বলেই নয়, মানুষ বলেই আমার সেইসব বাঙালীদের মুখে চেয়ে বুকে বড় কষ্ট হয়। আমাদের বুক বলে কি এখনও কিছু আছে? চোখ বলে?

বাঙালীর হয়ে এত কথা বলতে বসেছি বলে কেউ যেন ভাববেন না যে আমি একচক্ষু। বাঙালীর অনেকই দোষ। কোনো দোষ সম্বন্ধেই আমি অনবহিত নই।

বাঙালীর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিলেন জোব চার্নক। কলকাতায় বণিকের নৌকো লাগিয়ে। ব্রিটিশদের সংস্পর্শে এসে বাঙালী সবচেয়ে প্রথমে ইংরিজি শিখেছিলো। ফলে ইংরিজি-শিক্ষিত দেশের প্রথম এঞ্জিনীয়র, ডাক্তার, উকিল, আই-সি-এস, ভূতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ,

ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, সলিসিটর বাঙালীরাই হন। এবং তাঁরা সারা দেশে ছড়িয়ে যান। এর কারণে অন্যান্য প্রদেশীয়দের মধ্যে বাঙালীদের সম্বন্ধে যেমন একধরনের সম্মান গড়ে ওঠে তারই সঙ্গে একধরনের উষ্মাও গড়ে ওঠে। বাঙালীদেরই বড় বড় পদে, পেশায় একচেটিয়া অধিকার দেখে তাঁরা ধীরে ধীরে অবচেতনে বিরক্ত হতে আরম্ভ করেন। বাঙালীরাও মনে করতে থাকেন ইংরিজি জ্ঞান এবং শিক্ষা যেন সমার্থক। দেশ স্বাধীন হবার পর এবং তার দু-এক দশক আগে থেকেই যখন অন্য সব প্রদেশীয়রাও ইংরিজি শেখেন তখন বাঙালীর বোঝা উচিত ছিলো যে কেউই কম নন তাঁদের থেকে। কিন্তু ঐ মিথ্যে অহংকার তাঁদের মনে বাসা বেঁধে আছে আজও।

এটা লজ্জার।

বাঙালীর আরেকটি মস্ত দোষ যে বাঙালী কূপমণ্ডুক। নিজের প্রতিবেশিদের সম্বন্ধে বাঙালী কোনোদিনও ঔৎসুক্য দেখায়নি। অথচ সংস্কৃতিতে, নৃত্যে, গীতে, শিল্পকলায় ওড়িশা ও আসাম তাঁদের নিজস্বতায় বাঙালীর চেয়ে আদৌ পেছিয়ে ছিলেন না। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে বাঙালীর সাহিত্য ক্ষেত্রেও বিশেষ গর্ব করার মতো কিছু যে নেই একথা বাঙালী এখনও স্বীকার করতে রাজী নন। এটাও লজ্জার।

বাঙালী শারীরিক পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ। বাঙালী ঘরকুনো। বাঙালীর মধ্যে শ্রমের মর্যাদা দিতে জানেন আজকেও কম লোক। বাঙালী অনিয়মানুবর্তী, কাজ-না-করা, ইউনিয়ন-বানানো জাত হিসেবে আজকে সকলের কাছেই পরিচিত। বাঙালী চাকুরের জাতও। ব্যবসাকে বাঙালী এখনও ছোটো চোখেই দেখেন। সব ব্যবসা করতেই যে অনেক মূলধন লাগেই এমন সব ভুল ধারণা এখনও বাঙালীর মনে শিকড় গেড়ে আছে। আমি অনেক অবাঙালী কোটিপতিকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি যাঁরা জীবন আরম্ভ করেছিলেন মাথায় কাটা-কাপড়ের গাঁটরী নিয়ে অথবা সামান্য চাকরী দিয়ে। অবাঙালীর কারো প্রতিই আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। বরং তাঁদের কাছে আমার যা-কিছু শেখার

আছে বলে মনে করি তা সবসময়ই সযত্নে শিখি। কলকাতার বর্তমান মালিক যাঁরা, সেই সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আর কিছু না হোক পরিশ্রম করাটাও হয়তো শিখতে পারতাম আমরা। সবই গুণ তা বলব না কিন্তু গুণগুলি নিতেও দোষ কি ছিলো? আপনার পাড়ার মোড়ের পানের দোকানীও যে, অন্য দোকানদার ব্যবসায়ীদের কথা ছেড়েই দিলাম; উচ্চশিক্ষিত, টাই-পরা, হাতে ব্রিফ-কেস-নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ইংরিজি-বলা বাঙালী ভদ্রলোকদের চেয়ে অনেক বেশি আয় করেন এ কথাটাও বাঙালীর মাথাতে ঢোকানো যায়নি। ফলে, বাঙালী ব্রিটিশের আমলে যেমন, স্বাধীনতার পরও তেমনই; মুখ্যতঃ চাকুরের জাত হয়েই রয়ে গেলো। এ কথা ভেবেই বড় দুঃখ হয়। যে-কটি ব্যবসা বাংলীর ছিলো তা ভায়ে-ভায়ে ঝগড়া করে উঠে গেলো। এখন বাঙলাতেও বাঙালীর কটি ব্যবসা আছে তা হাতে গুনে বলা যায়। বাঙালীব দুর্দশার এও মস্ত কারণ। স্বীকার করতেই হয়। লজ্জা; লজ্জা!

অথচ যে-সব বাঙালী বাংলার বাইরে আছেন তাঁরা কিন্তু অন্যরকম। প্রবাসী বাঙালীরাই বাঙালীর গর্ব। আজও। এটা কেন হলো তা আমরা কখনও খতিয়ে দেখিনি। আমার অবাঙালী বন্ধুরা অনেকেই বলেন, "বাঙালী আদ্‌মী বন্‌তা বাঙালকা বাহার যাকর্"। কথাটা শুনতে আদৌ ভালো না লাগলেও কথাটার পেছনে যে সত্য আছে তা অস্বীকাব করতে পারি না।

অন্য সব প্রদেশীয়দের মধ্যেই 'প্রায়রিটি' বলে একটা ব্যাপার আছে। একটিমাত্র ছোট্ট জীবনে যে সব কিছু করা যায় না, তা তাঁরা মেনে নিয়েছেন। এবং নিয়েছেন বলেই যাঁরা ব্যবসা করেন শুধুই ব্যবসা করেন। গান শোনেন না, সাহিত্য পড়েন না, অনেকই সাংস্কৃতিক ব্যাপারে তাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কিন্তু যাঁদের আছে, তাঁরা গভীরে যান।

বাঙালীর কিন্তু সব ব্যাপারেই উৎসাহ। খেলা, সিনেমা, নাচ, গান, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য সবকিছু সম্বন্ধেই তার বিপুল আগ্রহ। অথচ টেস্ট ক্রিকেটে কজন বাঙালী খেলোয়াড় আজ অবধি খেলেছে তা তো আমরা জানিই। প্রথম শ্রেণীর ফুটবলের দলে নাইজিরিয়া,

জিম্বাবোয়ে থেকে খেলোয়াড় নিয়ে এসে আমরা খেলাই। অবশ্য এই সব ক্ষেত্রেও বাঙালীর প্রতি অবিচার করা হয়েছে। এবং হচ্ছে। হাতের সামনেই বলা যায় বাংলার অরুণলালের কথা। বেচারী অবাঙালী হয়েও, বাংলার হয়ে খেলছে বলে তার উপর অবিচার করা হলো। বাংলার বাসিন্দামাত্রই যে মনে-প্রাণে বাঙালী এবং বাংলার প্রতি তাঁদের প্রকৃত দরদ আছে একথা অবাঙালীদের প্রমাণ করার সময় এসেছে। যাঁরা বাংলার বাসিন্দা।

বাঙালীর মতো পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাজরজর প্রজাতি ভারতে কমই আছে। এবং দুঃখের কথা এইই যে, তার সব ঈর্ষা, শত্রুতা, তার নিজেদের প্রজাতিরই বিরুদ্ধে। ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট গত এক দশকে যত রেইড করেছে বাঙালীদের, তার মূলে বন্ধু, কর্মচারী, বাবা, ছেলে, শালা, ভগ্নীপতি, ভাই এবং ভায়রাভাই। অবাঙালী প্রতিযোগীরাও অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে করিয়েছেন।

এমন কলঙ্ক অন্য কোনো প্রজাতিরই নেই।

কোথায় যেন পড়েছিলাম যে, একটি মস্ত টিনের ড্রামে কাঁকড়া নিয়ে যাচ্ছিলো কেউ ট্রেনে অথবা স্টীমারে করে। কাঁকড়াতে ভর্তি ছিলো ড্রামটি অথচ তার মুখে কোনো ডালা ছিলো না। একজন ঔৎসুক্য বশে জিগগেস করেছিলেন, একী! কাঁকড়াগুলো তো লাফিয়ে পড়বে বাইরে! তাতে অন্যজন বলেছিলেন, কোনো ভয় নেই। এগুলো বাঙালী কাঁকড়া। একটা উপরে উঠতে চাইলেই অন্যরা তার ঠ্যাং কামড়ে টেনে নামাবে। বাঙালীদের চরিত্রর এর চেয়ে ভালো বর্ণনা বোধহয় হয় না। বাঙালীর কোনো একতা নেই। অন্যদের সম্বন্ধে কোনো সহানুভূতি, দরদ নেই। অন্য বাঙালী বড় হলে বাঙালী গর্বিত না হয়ে ঈর্ষান্বিত হয়। বন্ধু বা আত্মীয় বড় হলে বাঙালীর বুক ফাটে।

ছাত্রাবস্থায় আমি দিল্লীতে কিছুদিন ছিলাম। একটি বাঙালী ছেলে একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে 'চোখ মেরে' ছিলো। পরের দিন সকালে চারটি পাঞ্জাবী ছেলে সাইকেল করে এসে সেই বাঙালী ছেলেটির দুটি চোখই অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেছিলো। আর

আমাদের চোখের সামনে যখন অবাঙালীরা "বাঙালী ছোকরী লোটার" আনন্দে মত্ত থাকে তখন আমরা দেখেও দেখি না। নিজের বোনকে অপমান না করলে, নিজের পা না মাড়ালে, নিজের ভাইকে না মারলে আমাদের মধ্যে কোনো উত্তাপ দেখা যায় না। এই মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ অন্যরা নিয়েছে। ও নিচ্ছে। এমন দুর্দিনেই যদি বাঙালী একতাবদ্ধ না হয়, একের পেছনে অন্যে এসে না দাঁড়ায়; তবে কবে আর দাঁড়াবে? জাত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে?

কোনো বাঙালী যদি দশের কারণে কিছু করে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে নয়; তবে তার পাশে কাউকেই দাঁড়াতে দেখা যায় না। এই 'ভাবার সময়' আমি যখন লেখা মনস্থ করি তখন অনেক হিতার্থীই আমাকে বলেছিলেন: "জেলে যাবে"। "গুণ্ডাদের হাতে মার খাবে"। একজন বাঙালীও তোমার পেছনে এসে দাঁড়াবে না।" —কথাটা সত্যি কি মিথ্যা হয়তো শিগগীরই প্রমাণিত হবে।

বদল কি হবে না একটুও? আজকেও?

আপনাদেরই হাতে এই অপবাদ অপ্রমাণ করার ভার তুলে দিলাম।

তবে বাঙালীর যেগুলো দোষ সেগুলোই আবার তার গুণও। বাঙালীর মতো 'প্লেইন-লিভিং হাই-থিংকিং' এ বিশ্বাসী জাত বোধহয় ভারতে আর নেই। ওড়িয়া এবং অহমীয়ারাও তাইই। খেতে না পেয়েও পয়সা দিয়ে কিনে বই পড়েন বাঙালীরাই। গান শোনেন। নন্দন ক্ষেত্রের যাবতীয় শাখায় তাঁদের অবাধ বিচরণ।

কিন্তু হঠাৎই যেন বাঙালী তার চিরাচরিত চারিত্রিক গুণ ছেড়ে বাংলার অন্য ।ভাষাভাষীদেরই মতো টাকা-মনস্ক, কালার টি. ভি. আর ভি. সি. আর. এর ভারশূন্য, হালকা, সস্তা-সংস্কৃতিতে সামিল হয়ে পড়লো। সঙ্গ-দোষেই কি? পুরোনো বাঙালীর পা এখন দু-নৌকোতে। যেসব কারণে বাঙালী সারা ভারতের সম্মান পেয়ে এসেছিলো এতদিন সেই সব কারণই প্রায় লোপ পেতে বসেছে অথচ টাকা-রোজগারের প্রতিযোগিতাতেও তারা স্টার্টিং-

এই ডিসকোয়ালিফায়েড্। বাঙালীর ভবিষ্যৎ তার নিজেরই হাতে। যা সে ছিলো তা না হয়ে অন্য কিছু হতে হলে পুরোপুরিই অন্যদের মতো হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে যে অবাঙ্গালী সম্প্রদায়ের যেন-তেন-প্রকারেণ অর্জিত বিত্ত সবচেয়ে বেশি তাঁরা তিনটি জিনিসমাত্র জানেন জীবনে। প্রথম-ব্যবসা, টাকা-রোজগারের মেশিন। দুই-স্বাস্থ্য। তিন-সমাজ। সমাজে কারোও বিয়ে বা মৃত্যুতে তাঁরা যে-সংখ্যাতে এসে অন্যদের পাশে দাঁড়ান তা অভাবনীয়। স্বাস্থ্য খারাপ যাতে না হয় তার জন্যে তাঁদের চিন্তার শেষ নেই। তাঁদের জীবনের যা ভয়, তেমন বাঙালীর নেই।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলেছিলেন: "টাকার অংক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রাণের ভয়ও সমানুপাতেই বাড়ে।" কথাটি বোধহয় খুবই খাঁটি। প্রাণের ভয় ছাড়া অন্য আরেকটি ভয়ও তাঁদের আছে। তা হলো ইনকাম-ট্যাক্স। আইন লঙ্ঘন করতে তাঁদের কোনো জুড়ি নেই। দেশের জন্যে, সমাজের জন্যে, তাঁদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। ড্রাইভারদের গাড়ি চালানোর রকম দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন গাড়ির মালিক কে! পকেট-ভর্তি টাকা থাকায় বৃদ্ধ কী যুবা এঁরা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে যে পারেনই, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে; এমন একটি ধারণা এঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। অবিবেচনা, আইন-না-মানা, পুকুর চুরি করাকেই এঁরা সচরাচর যোগ্যতা বলে জেনে এসেছেন। তবে ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। ব্যতিক্রমই তো নিয়মকে প্রতিপন্ন করে। জীবনের সব ক্ষেত্রেই। এবং এঁদের সংস্পর্শের খারাপটুকুর ছোঁয়া বাঙালী তরুণদের মধ্যেও কিছু কিছু লেগেছে যে তাও দেখতে পাই। এর পরিণাম ভয়াবহ হবে।

লুডউইগ জন বাটোভেন, পৃথিবীবিখ্যাত জার্মান কম্পোজার তাঁর সহোদরকে যে উইল রেখে গেছিলেন তা এই রকম:

"মাই উইশ ইজ দ্যাট ইওর লাইফ মে বী মোর ফ্রী ফ্রম কেয়ার দ্যান মাইন হ্যাজ বান। রেকমেণ্ড ভার্চ্যু ট্যু ইওর চিল্ডরেন। শী এলোন, নট মানি, ক্যান গিভ হ্যাপিনেস। আই স্পাক ফ্রম এক্স-

পীরিয়েন্স। ইট ওজ্‌ শী অ্যালোন হু রেইজড মী ইন দ্যা টাইম অফ ট্রাবল; অ্যাণ্ড আই থ্যাংক হার, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মাই আর্ট, দ্যাট আই ডিড নট সীক টু এণ্ড মাই লাইফ বাই সুইসাইড। ফেয়ারওয়েল, অ্যাণ্ড লাভ ওয়ান অ্যানাদার।"

বীটোভেনের উইলের কথা প্রত্যেক বাঙালী মা-বাবার স্মরণ করাব সময় এসেছে। আমরা গরীব ছিলাম চিরদিনই অন্যদের তুলনায় কিন্তু চোর ছিলাম না। লোভী ছিলাম না। সহজে আমাদের কিনে নিতে পারতো না কেউই। তা সে আমরা পথের ট্রাফিক কনস্টেবলই হই অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো বড় সাহেব

শুধুই টাকাওয়ালা মানুষদের কোনোদিনও কোনো সম্মান ছিলো না আমাদের সমাজে। আজ কিন্তু আমরাও টাকাকেই সব বলে মনে করছি। মোটামুটি খেয়েপবে সৎপথে জীবন যাপন করতে যে টাকার দবকার তার কথা আমি বলছি না। বলছি মালহোত্রা, বা বর্মন, বা গনেরিয়ালা বা ধিরুভাইদেব টাকার কথা। অত টাকায দরকার কি? সুখ কোথায়?

রবীন্দ্রনাথের সেই গান বাঙালীর গাইবার সময় এসেছে 'পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি বসিবি নিরালায়/আয়, আয় বে ফিরে আয়/বিবাগী হিয়া বাহিব পথে কিসের খোঁজে গেলি/আয়, আয রে ফিরে আয়/'...

ভদ্রভাবে জীবন যাপনের জন্যে কিছু টাকার নিশ্চয়ই দবকার। কিন্তু আমরা কোনোদিনই, বার্ট্রাণ্ড রাসেলেব ভাষায বলতে গেলে: "স্ট্রাগল ফর এগজিস্টেন্স" এর সঙ্গে "নার্ভ-র‍্যাকিং একসারসাইজেস টু আউটশাইন আওয়ার নেবারস্" এর দর্শনে বিশ্বাস করিনি। আমার পেশায় সারাজীবন আমি বিভিন্ন-স্তরের বড়লোকদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছি। অনেক টাকা কি করে মানুষে কামায আর অনেক টাকা হলে মানুষ কী দুরন্তবেগে এক মনুষ্যেতর পর্যায়ে নামিয়ে ফেলে নিজেকে তা আমি অতি কাছ থেকেই দেখেছি। বেশি টাকার সাধনা বাঙালীর নয়। বাঙালী তার নিজস্ব, সুন্দর, সুখী,

সংস্কৃতিসম্পন্ন সহজ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল জীবন নিয়ে সুখী থাকলেই সুখী হবে। লক্ষ্মী বা গণেশ বাঙালীর আরাধ্য দেবতা নন। 'বাল্মিকী প্রতিভা'তে বাল্মিকীর মুখের সেই গান আছে না ?

"যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসো না, এসো না—"

লক্ষ্মী এসে বাল্মিকীকে লোভ দেখাচ্ছেন :

"কেন গো আপনমনে ভ্রমিছ বনে বনে,
সলিল দু নয়নে কিসের দুখে।
কমলা দিতেছে আসি রতন রাশি রাশি,
ফুটুক তবে হাসি মলিন মুখে।
কমলা যারে চায় বলো সে কী না পায়,
দুখের এ ধরায় থাকে সে সুখে।
ত্যেজিয়া কমলাসনে এসেছি এ ঘোর বনে
আমারে শুভক্ষণে হেরো গো চোখে।"

তবুও বাল্মিকী তাঁকে চলে যেতে বললেন। বললেন :

"দেবী গো, চাহি না, চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না—
তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক, হয় হোক—
আমি, দেবী, সে সুখ চাহি না।"

কুপথে রোজগারের অনেক টাকার সাধনা বাঙালীর সত্যিই নয়। নয় যে, তার প্রমাণ যে-বাঙালী অসৎ সেও দশটাকা থেকে পাঁচশো টাকাই চুরি করে বা ঘুষ নেয়। চুরি করলেও ছিঁচকে চোর হয়। ডাকাতি করা যখন রক্তে নেই তখন চোর হতেই বা যাওয়া কেন ? তার চেয়ে আমরা বরং আমরাই থাকি। চরিত্রে বড় হই, গুণে, সরস্বতীর সাধনাতে বড় হই ; যেখানে আমাদের মহিমামণ্ডিত আসন, যে-আসন ধূলিমলিন হয়ে পড়ে আছে অনেকই দিন হলো। লক্ষ্মীকে যেটুকু নাহলে মানুষের মতো বাঁচা চলে না সেটুকুই চাই। তবে লক্ষ্মীর কৃপাধন্যরা যা, সরস্বতীর সাধকদের উপর অত্যাচার চালাবে তাও আমরা সইব না।

"ইন্ অ্যাকুমুলেটিং প্রপার্টি ফর আওয়ারসেল্ভস্ অর আওয়ার পস্টারিটি, ইন ফাউণ্ডিং আ ফ্যামিলী অর আ স্টেট, অর অ্যাকুয়ারিং ফেম্ ইভিন্, উই আর মর্টাল বাট ইন ডীলিং উইথ ট্রুথ উই আর ইমমর্টাল্, অ্যাণ্ড নীড ফিয়ার নো চেঞ্জ নর অ্যাক্সিডেন্ট।"

—সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স—হেনরী ডেভিড থোরো

১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের মাথা-পিছু আয় ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিলো। মহারাষ্ট্র তখন দ্বিতীয় ছিলো। ১৯৪৮-তে মহারাষ্ট্র এগিয়ে গেলো। পশ্চিমবঙ্গ ষষ্ঠ স্থানে নেমে গেলো। তার মাথা-পিছু আয় জাতীয় গড়েরও নিচে নেমে গেলো ১৯৪৮-তে। "দ্যা সো-কলড্ প্ল্যানড ডেভালাপমেণ্ট অফ দ্যা কানট্রি, হ্যাজ ফর ওয়েষ্ট-বেঙ্গল ট্রুলি বীন্ প্ল্যান্ড্ ডিকেড্যান্স।"

রণজিৎ রায় তাঁর বই 'অ্যাগনিজ অভ ওয়েষ্ট বেঙ্গল'-এ লিখেছিলেন।

চতুর্থ যোজনাতে পশ্চিমবঙ্গর মানুষের জন্যে মাথাপিছু খরচ করা হয়েছিলো ৬৯ টাকা। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে নিম্নতম। জাতীয় গড়ের খরচের চেয়েও পঞ্চাশ টাকা কম।

পশ্চিমবঙ্গ ১৯৫০-এ যখন সবচেয়ে স্বচ্ছল ছিলো তখনও পশ্চিমবঙ্গে বাঙালীদেরই আধিপত্য ছিলো। কিন্তু সতেরো বছরে

মধ্যে বাঙালীদের এই দুর্দশা, এই অধঃপাত কি শুধুমাত্র তাদেরই একার দোষে হলো? এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, বিহার, ওড়িশা, আসামকে পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও বেশি অবহেলা করা হয়েছিলো তবে তাদের পক্ষে বাঁচোয়া এইটুকুই ছিলো যে তাদের এই মারাত্মক উদ্বাস্তু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি। ১৯৪৮তেই যদি এইরকম ছবি ছিলো তবে ১৯৪৮তে অবস্থাটা কিরকম দাঁড়াতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

আসাম থেকে বাঙালীদের যে 'বঙাল খেদা' আন্দোলনে বিতাড়িত হতে হয়েছিল, দুবার করে উদ্বাস্তু হতে হয়েছিলো, তার পেছনে অহমিয়াদের যতখানি হাত ছিলো তার চেয়ে বেশি ছিলো এক শ্রেণীর ব্যবসাদারদের, যারা আজ পশ্চিমবঙ্গের ডি-ফ্যাক্টো মালিক। অহমিয়ারা, ওড়িশাবাসীরা এবং বিহারীরাও আস্তে আস্তে তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারবে যখন সেই সব রাজ্যের সমস্ত কল-কারখানা, আয়ের সমস্ত উৎস তারাই কুক্ষিগত করে নিয়ে মূলতঃ নির্বিরোধী, শান্তিপ্রিয়, সরল পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের একই অবস্থাতে এনে দাঁড় করাবে একদিন, যেমন তারা আজ করেছে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের।

১৯৪৮-র আগে পার্লামেণ্টে যে বাক-যুদ্ধ হতো তা সীমিত ছিলো কংগ্রেসী ও বামপন্থীদেরই মধ্যে। কিন্তু বামফ্রন্ট যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাতে এলেন তখন বাঙালী কংগ্রেসী এম পি.-রা বাঙলার স্বার্থের, নিজের রাজ্যের মানুষের স্বার্থের, নিজেদের ভাই-বোনের ভবিষ্যত-এর সর্বনাশ করে বামফ্রণ্টের এম. পি-দের বরাবরই বিরোধীতা করে এসেছেন পার্টি-ম্যানডেটে। সেই সব হাত-তোলা, অন্ধ, মোসাহেব এম. পি-দের নিয়ে হাসাহাসি করেছেন অন্য রাজ্যের এম. পি.-রা। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকের কংগ্রেসী এম. পি.-রা নিজেদের রাজ্যকে সুবিধা দেওয়ার জন্যে যখন হাতে-হাত মিলিয়ে নিজেদের স্বার্থে নিজেদের পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও লড়েছেন তখন বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বাঙালীর সর্বনাশ করেছেন একবারও বাংলার কথা না ভেবে।

বাংলার আজকের অবস্থার জন্যে তাঁরাই অনেকখানি দায়ী।

ব্রিটিশ আমলে বাঙালীদের সেনাবাহিনীতে নেওয়া হতো না। কারণ তাঁদের মতে বাঙালী 'মার্শাল রেস' ছিলো না। বাঙালীরা তাঁদের অনেকই দুর্ভোগে ফেলেছিলেন বলেই এই নীতি তাঁরা নিয়েছিলেন। বাঙালী 'মার্শাল রেস' কী নয় তা নেতাজী সুভাষ পরে প্রমাণ করেছিলেন।

স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তরের মুখপাত্র (এ. এল. ভেঙ্কটেশ্বারান সেক্রেটারী, ন্যাশানাল ডিফেন্স অ্যাকাদেমী, ডিফেন্স অর্গানাইজেশান্ অফ ইণ্ডিয়া পাবলিকেশানস্ ডিভিশান, ১৯৪৮-র রিপোর্টে বললেন: "দ্যা থিওরী অফ মার্শাল অ্যাণ্ড নন-মার্শাল ক্লাসেস ওজ কমপ্লিটলী এক্সপ্লোডেড ডিউরিং দ্যা সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার· ···দেশ স্বাধীন হবার পরই ভারতীয় সরকার যে ওই প্রাদেশিকতা ও ধর্মীয় বাছবিচার ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে উঠিয়ে দেবেন যাতে সবভারতীয়ই প্রতিরক্ষার বিভিন্ন বিভাগে যোগ দেবার সমান সুযোগ সুবিধা পায়।'

কিন্তু স্বাধীন ভারতের শাসকদের অনেক চিৎকৃত প্রতিশ্রুতিরই মতো এই ঘোষণাও কাগজ-পত্রেই সীমাবদ্ধ থাকলো। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি অল-ইণ্ডিয়া-রেডিওর যুববাণী অনুষ্ঠানে ১৯'শে আগষ্ট ১৯৪৮-এ আমরা শুনলাম যে, "ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রীজনস্ অ্যারাইজিং আউট অফ প্রীভিয়াস কমিটমেণ্টস্ এণ্ড লোকেশান অফ স্ট্রপস, ইট ওজ নট পসিবল টু ইমপ্লিমেন্ট্ দিস ডিসিশান ইমীডিয়েটলী ইন দ্যা কেস অফ ইনফ্যানট্রি এণ্ড আর্মর্ড কর্পস।"

ভারতে যদি আবার এমার্জেন্সী আসে যদি আর্মি-রুল হয় কখনও রাজনৈতিক নেতাদের খেয়োখেয়ির কারণে তবে বাংলার কথায় কর্ণপাত করার কেউই থাকবে না। মুষ্টিমেয় অফিসার ছাড়া বাঙালীর কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই সেনাবাহিনীতে। শিখরা বা গুর্খারা যে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ধম্‌কে কথা বলেন তার পেছনে সেনাবাহিনীতে তাঁদের গভীর শিকড় এক প্রধান শক্তি। তাঁরা রেগে কিছু বললে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোযোগ পেতে পারেন কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষয়িষ্ণু ভেতো বাঙালীর কথায় কান দেবে কে?

কেন্দ্রের কৃষি-ফসলের দাম নির্ধারণের নীতি, রেলের মাশুল

নির্ধারণের নীতি, রপ্তানী সাবসিডিসির নীতি, বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের ওপর আমদানীর এনটাইটেলমেন্টস-এর নীতি, লাইসেন্সিং-নীতি এবং পাবলিক সেক্টর আণ্ডারটেকিংগুলির জন্যে লগ্নীর নীতি ও তাদের স্থান নির্বাচন পুরো পূর্বাঞ্চলকে রুগ্ন করেছে ইচ্ছাকৃতভাবে। আয়রন এবং স্টীলের দামের সারাদেশে একীকরণ, পাটের দাম অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের দামের তুলনায় কম করে রাখা, পূর্বভারতকে স্বাধীনতার পর থেকে শুধুমাত্র ১৯৪৮ অবধিই ৩০০০ কোটি টাকা বঞ্চিত করেছে। আয়রণ-এবং স্টীলের দাম সারা ভারতে এক করে দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে কল-কারখানা না-স্থাপনে অবাঙালীর অসুবিধা হয়নি। কয়লার উপর রেলওয়ে মাশুলের কেন্দ্রীয় নীতির কারণে অন্যান্য দূরের প্রদেশ যেমন অভাবনীয়ভাবে লাভবান হয়েছে পূর্বাঞ্চলের শিল্পগুলিকে তেমনই অন্যান্য সমস্ত কাঁচামাল, যা তাদের আনতে হয়েছে দূর রাজ্য থেকে; গুণতে হয়েছে অবিশ্বাস্য মাশুল। তাছাড়া এইসব নীতি পশ্চিমবঙ্গকে কোনো বিশেষ শিল্প স্থাপনে কোনোরকমভাবে কাউকে উৎসাহিত করা দূরের কথা, তাদের দূরেই সরিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার জন্যে কেন্দ্রের দরদ কুমীরেরই কান্না বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কয়লা থেকে সীন্থেটিক পেট্রোলিয়াম বানানো যায় কী না তার জন্যে বিদেশী কনসালটান্ট ফার্মকে এদেশে আনা হয়েছিলো পরামর্শ নেবার জন্যে। তাদের মধ্যে কপার্স (কপার্স ইনকরপরেটেড) ১৯৪৮-এ দামোদর উপত্যকা ঘুরে গিয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ঐ উপত্যকা সীন্থেটিক পেট্রোলিয়ামের কারখানার জন্যে পরম উপযুক্ত। আরেকটি পরামর্শদাতা সংস্থা লুর্গি গেসেলস্ক্যাফ্‌ট্‌ও ১৯৪৯-এ আসেন তাঁরাও চমৎকার রিপোর্ট দেন। কিন্তু কেন্দ্র ঐ দুই পরামর্শদাতার রিপোর্টই মানেননি এবং পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপনে অনীহা দেখিয়েছিলেন 'অনেক টাকার ব্যাপার' বলে।

অথচ যাঁরাই রিফাইনারি করতে চেয়েছেন বম্বেতে, যে কোনো কলকারখানা তাঁদেরই 'হ্যাঁ' করা হয়েছে। ১৯৫১-তে তৎকালীন ইণ্ডাস্ট্রীজ সেক্রেটারী দেশাই সাহেব স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম এবং

বার্মাশেলকে (এস্সো) দুটি রিফাইনারী করার অনুমতি দিয়েছিলেন আমদানীকৃত "ক্রুড"-এর ভিত্তিতে। বম্বেতেই ঐ দুটি রিফাইনারী স্থাপিত হয়েছিলো যদিও কলকাতা তখন ভারতের সবচেয়ে বড় বন্দর ছিলো এবং পূর্বাঞ্চল ছিলো পেট্রোলিয়াম প্রডাক্টসের সবচেয়ে বড় ব্যবহারকারী। দেশের বিদেশি-মুদ্রার সংকটের সময়ে আমদানীকৃত 'ক্রুড'-এর ভিত্তিতেও ঐ কারখানা দুটি করতে দেওয়া হয়েছিলো দামোদর ভ্যালীতে এতো কয়লা থাকা সত্ত্বেও। বছরে ৭ থেকে ১৭ কোটি টাকা বিদেশি-মুদ্রা ঐভাবেই নষ্ট করা হয় পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করে মহারাষ্ট্রকে আরও বড় করার জন্যে। যেখানেই বেসিক-ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে তার আশে পাশে অসংখ্য আন্সিলারি-ইণ্ডাষ্ট্রীও গড়ে ওঠে। বম্বের অগ্রগতি সমানে অব্যাহত থেকেছে কেন আর পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়েছে কেন তার একটি নমুনা এই।

বাঙালীর দোষ অনেকই। কিন্তু আজকে বাঙালীর যা দুর্দশা তার জন্যে বাঙালীর দোষই একমাত্র কারণ নয়।

আসামে কয়েকটি নতুন তেলের খনি আবিষ্কৃত হবার পরও কেন্দ্র চুপ-চাপ বসেছিলেন। আসাম ওখানে রিফাইনারী করতে কেন্দ্রকে বাধ্য করতে জোরদার আন্দোলনে না নামলে আসামও পেতো না ঐ রিফাইনারী।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্য সব রাজ্যের তফাৎ হচ্ছে এই যে এখানে এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধি বা কামাচকাট্কায় অত্যাচার বা দিয়েগো গার্সিয়ায় মার্কিন ঘাঁটির বিরুদ্ধেই চিরদিন আন্দোলন হয়, পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক ভালোর জন্যে কোনো আন্দোলনই হয় না। এখানের বুদ্ধিজীবীরাও নিজের প্রজাতির স্বার্থের প্রতি অন্ধ হয়ে থেকে প্রত্যেকে বিশ্বমানব হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, বিশ্বে বিখ্যাত হওয়ার স্বপ্ন। রাজনৈতিক নেতারা দেখেন নিজেদের 'ইজম্', আর গদী আর ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির স্বপ্ন। অথচ সারা ভারতের মানুষের কাছে শুনতে হয় বাঙালী নাকি প্রচণ্ডরকম প্রাদেশিকতা-মনস্ক জাতি। ভাগ্যেরই পরিহাস বলতে হবে একে।

আসাম, বিহার, ওড়িশা আর পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধেই প্ল্যানিং-কমিশান

আর কেন্দ্রর যত অনীহা আর অসূয়া। অথচ মহারাষ্ট্র, গুজরাটের তামিলনাড়ুর প্রতি তাঁদের ততই উৎসাহ। ১৯৬০ এ গুজরাটের আঙ্কালেশ্বরে যেই তেল পাওয়া গেলো ১৯৬৩-র মধ্যে গুজরাটে এক প্রকাণ্ড রিফাইনারীর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলো। ১৯৬৫ থেকে দশলক্ষ টনীর উৎপাদনও শুরু হয়ে গেলো। ১৯৪৮ তে ক্যাপাসিটি ত্রিশ লক্ষ টনী করে দেওয়া হলো।

একটি জার্মান সংস্থাও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পশ্চিম জার্মানীর কোল্যাবরেশনে ইণ্ডাস্ট্রী করবার জন্যে এসেছিলো তাদের পশ্চিমবঙ্গে আসতেই দেওয়া হলো না আদৌ। আর এদিকে সবসময়ই আমাদের শুনতে হয় "পূর্বাঞ্চলের মানুষেরা আদৌ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-মাইণ্ডেড নয়"।

আই-টি-ডি-সি আসামের কাজিরাঙ্গা এবং ভারতের অন্য সমস্ত রাজ্যে অসংখ্য ট্যুরিস্ট-লজ বানিয়েছেন। বিহারের পালামৌর বেতলাতে, আসামের মানাসেও লজের কাজ শুরু হয়েছে এবং হবে অথচ হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গর কোথাওই, না দার্জিলিংএ, না উত্তরবঙ্গের মতো জায়গাতে একটি লজও হলো না চল্লিশ বছরেও। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আমি দেখেছি। উত্তরবঙ্গর তিস্তা-তোর্ষার উপত্যকায় নগাধিরাজ হিমালয়ের যে রূপ, যে আদিম বনরাজিনীলার সৌন্দর্য তা পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। কেন্দ্র তাঁদের বিশেষ ইচ্ছায় পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং দার্জিলিংএ যাতে বিদেশি পর্যটকরা না আসেন তারই বন্দোবস্ত প্রথম থেকেই পাকা-পোক্ত করে রেখেছিলেন। তাঁদের এই নীতিই আজ দার্জিলিং এর উত্তেজনার মূলে। এদিকে দোষ পড়ছে পশ্চিমবঙ্গর ঘাড়ে। এবং তাতে নাকি মদত দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গরই কংগ্রেস নেতারা। এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে?

প্রায় কোনো বহুজাতিক বড় সংস্থাকেই পশ্চিমবঙ্গে কারখানা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়নি স্বাধীনতার পর। ডানলপ ইত্যাদির কারখানা তো আগে থেকেই ছিলো। ফিলিপস ইণ্ডিয়ার দৃষ্টান্তটি কেন্দ্রর লজ্জাহীনতার দলিল হয়ে আছে। ফিলিপস্ ইণ্ডিয়া লিঃ যখন (ইলেকট্রিকাল বাল্ব এবং আনুষঙ্গিকের প্রস্তুতকারী) পশ্চিমবঙ্গে

তাদের কারখানার এবং উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ করতে চাইলেন তখন কেন্দ্র বাধা দিলেন। কিন্তু কেন্দ্ররই উৎসাহে এবং সহযোগিতায় ফিলিপস্ মহারাষ্ট্রে বিরাট কারখানা করতে পারলেন। বিদেশি কোম্পানী জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবেই বা কেন? ফিলিপস্, ৩১শে জানুয়ারী ১৯৩০ থেকে কলকাতায় রেজিস্টার্ড অফিস নিয়ে কাজ শুরু করেছিলো! ৩১শে অক্টোবর ১৯৫৭তে কোম্পানীটি পাবলিক লিমিটেড হলো। তখন এঁদের বিদেশি ইকুইটি হোল্ডিং ছিলো ৬৭ শতাংশ। মহারাষ্ট্রর কারখানা ১৯৫৮তে খোলেন ওঁরা। ফিলিপস্ যখন তাঁদের কলকাতার প্রস্তাবিত নতুন কারখানাতে উৎপাদন অনেক বাড়াবার প্রস্তাব নিয়ে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সের জন্যে দরখাস্ত করলেন তখন তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে বলা হলো মহারাষ্ট্রতেই করুন। পশ্চিমবঙ্গে করতে চাইলে লাইসেন্স দেবো না। এখন পশ্চিমবঙ্গর তুলনাতে তাঁদের মহারাষ্ট্রর কারখানা অনেক গুণ বড়ো। অনেক হাজার বেশি কর্মচারী সেখানে কাজ করেন। ফিলিপস্ ইণ্ডিয়ার রেজিস্টার্ড অফিসও এখন বম্বেতেই। এ সম্বন্ধে আরও জানতে হলে, পশ্চিমবঙ্গের ডিরেকটর অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ উপানন্দ চ্যাটার্জি যে কিরকম লড়াই করে ছিলেন এই সম্প্রসারণ যাতে পশ্চিমবঙ্গেই হয় সেই কারণে, রনজিত রায়ের 'অ্যাগনিজ অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল' বইটির পরিশিষ্ট দেখুন। উপানন্দবাবুর চিঠির প্রতিলিপি পর্যন্ত রনজিত বাবু তাতে সংযোজিত করেছেন

বড়ই দেরী হয়ে গেছে। বাঙালীর ভবিষ্যৎ এখন আপনাদেরই হাতে, আপনাদের নির্বাচিত কংগ্রেসী অথবা বামপন্থী নেতাদের আন্তরিকতা, কর্মক্ষমতা, কেন্দ্রর সঙ্গে রাজ্যর কারণে দাঁতে-দাঁত চেপে লড়াই করার ক্ষমতার উপরই নির্ভর করছে। দয়া তো অনেকদিনই চাওয়া হলো, চাওয়া হলো করুণা ভিক্ষা, যাঁদের সিদ্ধান্তে বাংলা আজ বিভক্ত, যাঁদের পক্ষপাতিত্বে রিক্ত; তাঁদের কাছে করুণা আরও কতদিন আপনারা চাইবেন তা আপনাদেরই সিদ্ধান্তর ব্যাপার।

এদিকে দার্জিলিংএর গুর্খারা ছাড়াও, পুরুলিয়ায় কুরমালি ভাষাভাষীরা, উত্তরবঙ্গের কোচ, মেচ ও রাজবংশীয় ভাষাভাষীরা

দাবী করছে পৃথক কামতালুর রাজ্যের। সদানি ভাষাভাষি মেদিনীপুরের পুরুলিয়ার ঝাড়খণ্ডীরাও। শোনা যাচ্ছে, এঁদের পেছনে অন্য কোনো রাজ্যর মদতও আছে। সেদিন নিহত হলেন আসামের সংখ্যালঘু নেতা কালিপদ সেন। ত্রিপুরাতেও পার্বত্য উপজাতিরা বাঙালীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার শুরু করেছে। এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদকে রুখতে না পারলে বাঙালীদের কি হবে? নিজ রাজ্যেও তো, নিজ রাজ্যের রাজধানীতেও তো আমরা মূক, নির্বাক, মাথানিচু-করে থাকা মানুষ। আমাদের সাহায্য করার কেউই তো আছে বলে দেখছি না। নিজেরা যদি নিজেদের জন্যে এখনও বাঁচার পথের কথা না ভাবি তবে এই জাতের বাঁচার কোনো অধিকারই নেই।

স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশরা বাংলাকে অনেকবারই ভাগ করে দুর্বল করে দিয়েছিল। অহোম রাজারা কোচ রাজারা বা কলিঙ্গ রাজারা বাংলার এবং বাঙালীদের সঙ্গে কখনও শত্রুতা করেননি আগে। ব্রিটিশের "ডিভাইড এণ্ড রুল্ পলিসী" কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেমন ভাবে গ্রহণ করেছেন কোনো দেশীয় নীতি তেমন ভাবে গ্রহণ করেননি। স্বাধীনতা পাবার সময়ও বাংলা ভাগ হলো। স্বাধীনতার পর রি-অর্গানাইজেশন অফ স্টেটস্ যখন করা হলো তখনও বাংলার কথাতে কর্ণপাত করা হলো না। আবারও টুকরো করা হলো তাকে আর স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরে, নির্বাচনের মুখে এই সাংঘাতিক বিস্ফোরক অবস্থার মধ্যে এসে পৌঁছেছে পশ্চিমবঙ্গ। এ নিয়ে আপনাদের ভোট-প্রার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করুন। জানতে চান তাঁদের কাছে কি ভাবে তাঁরা এই সব সমস্যার মোকাবিলা করতে চান বা পারবেন। তারপরই ভেবেচিন্তে ভোট দিন। এই নির্বাচনের ফলই পশ্চিমবঙ্গর ভাগ্যকে নির্ধারিত করবে। নিজেরা বিচার করুন, আলোচনা করুন, বাড়িতে, দলীয় কর্মচারীদের সঙ্গে যদি আপনি কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন; না থাকেন তো আপনার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করুন। করে, তারপরই মনস্থির করুন। এই বারের ভোট নিয়ে জুয়া খেলবেন না দয়া করে।

"কিংগস অ্যাণ্ড প্রিন্সেস্ ক্যান মেক প্রফেসরস অ্যাণ্ড প্রেভী কাউন্সিলারস্ অ্যান স্যান্ অ্যাওয়াড টাইটেলস্ অ্যাণ্ড অর্ডারস্, বাট গ্রেট মেন দে ক্যান্ট্ মেক, নট্ দ্যা ইনটেলেক্টস্ হুইচ্ বাইজ অ্যাবাভ দ্যা মাসেস।"

— লুডউইগ ভন্ বীটোভেন

চল্লিশটা বছর এক অতি দীর্ঘ সময়। চল্লিশ বছরের অনেক আগে বিধ্বস্ত পশ্চিম জার্মানী, জাপান, নবজাত ইজরায়েল, কিউবা রাশীয়া এবং চীন সাধারণ লোকের মূল প্রয়োজনের ব্যাপারে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠে পৃথিবীতে প্রধান শক্তিগুলির অন্যতম হয়ে উঠছে এবং উঠেছে। আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার আগে ঐ সব দেশের নেতারা জাতির সমস্ত মূল সমস্যার প্রকৃত সমাধানে নিজেদের আন্তরিক ভাবে নিয়োজিত করেছেন। কোথাও কোথাও জোর খাটাতে হয়েছে দেশেরই লোকের ভালোর জন্যে। ঐ সব দেশের নেতাদের জীবন যাত্রার সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার তফাৎ বিশেষ নেই। তা সে দেশ ক্যাপিটালিস্টই হোক কী কম্যুনিষ্টই হোক। এখানে কি হল? বক্তৃতা শুনেই কি পেট ভরেছে আমাদের সাধারণ মানুষের?

প্রধানমন্ত্রী, যিনি অর্থমন্ত্রীও, এবারে তাঁর বাজেট বক্তৃতাতে বলেছেন, "দ্যা ফাণ্ডামেণ্টাল অ্যাসাম্‌শান্ অফ্ দ্যা সেভেন্থ প্ল্যান, অ্যাজ ইন্‌ডীড্ অফ্ ওল, আওয়ার ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানস্, ইজ দ্যাট গ্রোথ অ্যাণ্ড

ডেভালাপমেন্ট আর দ্যা রিয়্যাল্ অ্যান্টিডোটস্ টু পভার্টি।” শুধু কথাতে যে আর চিঁড়ে ভিজছে না। সহ্য শক্তিরও শেষ হয়ে আসছে। তাছাড়া জনসংখ্যা সীমিত না হলে দারিদ্র কখনও ঘুচবে না।

উনি বাজেট বক্তৃতাতে আর এক জায়গায় বলেছেন ঃ “আই অ্যাম কমিটেড টু প্ল্যানিং ফর্ সোশ্যালিজম্ ইন্ ইণ্ডিয়া, সোশ্যালিজম্ হুইচ্ ফিটস্ ইন্ উইথ্ আওয়ার জিনিয়াস্ বাট নেভার্দিলেস্ সোশ্যালিজম্ ইন্ ইট্স্ বেসিক মীনিং অফ রিমুভিং ডিস্প্যারিটিজ্ অ্যাণ্ড প্রভাইডিং ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি, দিস্ ইজ দ্যা ইয়ার্ডষ্টিক্ বাই হুইচ্ আই ওয়ান্ট্ টু জাজ ওল্ পলিসিজ্ অ্যাণ্ড প্রোগ্রামস্।”

প্রত্যেক বাক্যতেই আমি কথাটা বড় বেশিবার আছে। রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে ‘আমরা’ বলা উচিত, ‘ভাবা’ উচিত, মনে হচ্ছে ওঁদের পারিবারিক মেগালোমানিয়া রোগে ওঁকেও বড় অল্প বয়সে আক্রান্ত করেছে।

সোশ্যালিজম্? কিসের সোশ্যালিজম? চল্লিশ বছরে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ আর মুষ্টিমেয় শিল্পপতি, ব্যবসাদারদের অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রচিত হয়ে গেছে তা বলার নয়। রাজীবের প্রধানমন্ত্রীত্বর আমলেই (মৃত্যু-কর) তুলে দেওয়া হয়েছে। এটা অভাবনীয় কোনো সোশ্যালিষ্ট-ভাবাপন্ন দেশে। বাবার টাকাতে বসে মজা করার কোনো যুক্তি ক্যাপিটালিষ্ট দেশরাও মানে না। এই সোশ্যালিজম এ স্বোপার্জিত কষ্ট-লব্ধ আয়ের উপর করভার সবচেয়ে বেশি আর পিতৃপুরুষ-অর্জিত আয়ে বসে খাওয়ার বন্দোবস্ত পাকা করা হয়েছে। এই তথাকথিত সোশ্যালিজম্ এর দেশে ক্যাপিটাল গেইনস্ ট্যাক্সও প্রায় নেই বললেই চলে। পিতৃপুরুষের সম্পত্তি বিক্রী করে যে পরিশ্রমহীন মুনাফা, তা যদি কোটি টাকাও হয়; তবুও কিছুদিনের মধ্যে ক্যাপিটাল গেইনস ইউনিট ট্রাস্ট এবং এ বাবদে তালিকাভুক্ত অন্যান্য লগ্নীতে সে টাকা মাত্র তিন বছর নয় শতাংশ সুদের বিনিময়ে রেখে দিলে যিনি টাকা পেলেন তাঁকে এক পয়সাও ক্যাপিটাল গেইনস্ ট্যাক্স দিতে হবে না। সোশ্যালিজম্ই বটে।

ব্রিটিশরা দেশ শোষণ করতে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদেব সময়ে এবং অনেক দিন পর অবধিও, রোজগার করা আয় আর বিনা-রোজগারের আয়ের মধ্যে করের ব্যবধান ছিলো। আপনাবা যাঁরা চাকরী করেন, যাঁরা পেশায় নিযুক্ত আছেন তাঁবা যাইই আয় কবেন তার জন্যে প্রচুর ব্যক্তিগত পরিশ্রম করতে হয় অথচ অনেক ব্যবসায়ীরা মূলতঃ মূলধনেরই জোরে, একটি টেলিফোনে ফাটকা কবে এক মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেন। যাঁরা সুদে টাকা খাটান, যাঁরা বাড়ি ভাড়াব রোজগারে বসে খান তাঁদের আয়ের উপরেও যে কর চাপানো হতো তখন পরিশ্রমের রোজগারের উপর একই হাবে ট্যাক্স চাপানো হতো না। এই নয়া সোশ্যালিজম্ নীলকরদের কবা আইনের চেয়েও বিস্ময়কর।

আমি বলব, ব্যক্তিগত পরিশ্রমের আয়ের উপর সবচেয়ে কম কর বসানো উচিত। বয়স্ক মানুষ, যাঁবা কাজ ছেড়ে দিয়েছেন এবং বাড়ি ভাড়া বা ব্যাঙ্কের সুদের উপর ভর করে সংসার চালান সে আয় পরিশ্রমকৃত না হলেও যেহেতু নিজের সারা জীবনের পরিশ্রম থেকে তা বাঁচানো ; তা করমুক্ত করা উচিত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবার জীবদ্দশাতে এবং পুত্র-কন্যার পায়ে-দাঁড়ানো পর্যন্তও এই আইন বলবৎ রাখা উচিত। যাঁর যেমন যোগ্যতা তিনি তেমন রোজগার করবেন অবশ্য যদি রোজগার করার সুযোগ আদৌ তিনি পান। কিন্তু নিজস্ব রোজগারের আয় এবং নিজস্ব রোজগার থেকে সঞ্চিত অর্থ-জাত আয় বিশেষ চোখে দেখা উচিত। যাঁরা চাকরী করেন তাঁরা যেই হন না কেন চিফ-সেক্রেটারী অথবা হাইকোর্টের জাজ, পেনসনের টাকা থেকে ট্যাক্স কেটে যা থাকে তাতে এই বাজারে সংসার চলে না।

পৈতৃক সম্পত্তি হস্তান্তরিত হবার সময় কর দিতে হয় না, লগ্নী করা মূলধনী-সম্পত্তি বিক্রী করে পরিশ্রম ও গুণহীন যে প্রভূত আয় তার উপরেও কর লাগে না যে দেশে সেই দেশই তো সত্যিকারের সোশ্যালিষ্ট !

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ অবধি কৃষিক্ষেত্রে কর

বসালেন না কেন্দ্রীয় সরকার। পাঞ্জাব-হরিয়ানার অনেক কৃষকদের সঙ্গে রাজা-মহারাজাদের জীবনযাত্রার কোনো তফাৎ নেই। অথচ কৃষির আয়ের উপর তাঁরা এক পয়সাও কর দেন না। আপনি অধ্যাপকই হোন, কি শিক্ষকই হোন, কী করনিকই হোন আপনার মাইনে থেকে, পেশার রোজগার থেকে ট্যাক্স আপনাকে দিতেই হয়।

কিন্তু কে ট্যাক্স বসাবে তাঁদের উপর ? কার বুকে এতো সাহস ? কে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলবে এ দেশে ? ভোটে হাত পড়বে যে ! চরন সিং এর জাট-লবী, পাঞ্জাবের কৃষকরা দিল্লীর গদী উল্টে দেবে না তাঁদের উপর কর ধার্য হলে !

তাইই এতবার বলছি যে, ভোটই আসল, গদীই আসল, দেশ, আপনি, আপনার ভবিষ্যৎ, আপনার ছেলে মেয়েব মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন সব গোল্লায় যাবে। মোগোলদের পর ব্রিটিশরা ছিলো আমাদের নবাব। বাংলাতে "বেইমান মীরজাফররা" এখনও আছেই, শুধু নয়, সংখ্যায়ও অনেকই বেড়েছে। তাই দেশ স্বাধীন হবার পরও আমাদের এই হতভাগ্য বাংলার, গোলামি করার কপাল-লিখন বদলালো না।

পার্লামেন্টে এই সব বাজেটের হাততালি আপনাদের বলির পাঁঠাদের ঘাড়ে রামদার কোপেরই মতো পড়ে। মুদ্রাস্ফীতির বোঝার প্রায় সবটুকুই এসে পড়ে সাধারণ মানুষদেরই ঘাড়ে।

মাঝে মাঝে ভাবি আমাদের দেশে তো শুনি কত বড় বড় অর্থনীতিবিদ আছেন। বাংলাতেও আছেন। তাঁরা কেন ঝগড়া করেন না ? প্রতিবাদ করেন না কেন এই অন্যায়ের ? কেন্দ্রেও তো অর্থনীতিবিদদের অভাব নেই। তবে ?

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে যায়। বলাটা কি ধৃষ্টতা হবে ? কিন্তু কথাটা আমার কথা নয়। ডঃ রাধাকৃষ্ণানের কথা। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের বক্তৃতাতে বলেছিলেন ১৯৫৩-তে। বলেছিলেন : "মোর ছ্যান্ ইণ্টেলেক্চুয়াল্ এবিলিটি অ্যাণ্ড স্কিল্, হোয়াট

মেক্‌স্ উ্য ভ্যালুয়েবল্ ট্যু দ্যা সোসাইটি ইজ ইওর ডিভোশান্ টু আ গ্রেট কজ।”

আমাদের ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর শেষ বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের কথাও মনে পড়ে যায় বার বার। জর্জ দ্যা সিক্সথ্‌কে ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে তিনি নানা বিষয়ে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। তাতে বলেছিলেন যে, “উই হ্যাভ ডান্ দ্যা ওয়ারস্ট্ ইন্ দ্যা ফীল্ড অফ এডুকেশান্। উই হ্যাভ গিভন্ দেম্ এডুকেশান্ অফ লেটার্স বাট নট অফ ক্যারেকটার্।” সেই কারণেই কি এই হতভাগ্য দেশে পণ্ডিতদের ভীড়ে পথ চলা দুষ্কর হলেও ঘটার মতো, হওয়ার মতো কিছুই ঘটছে, ও হচ্ছে না? জানি না। আমার আপনার মতো অশিক্ষিত সাধারণ মানুষেরা কতটুকুই বা জানি?

বাংলার সব মানুষই কি ইঁদুর হয়ে গেছেন?

এই বাজেটেই রাজীব বলেছেন “দেয়ার্ ইজ নো রুম্ ফর্ ওয়েস্ট, অস্টেন্‌টেশান্ অর্ আন্‌প্রডাকটিভ এক্সপেন্‌ডিচার। উই হ্যাভ্ টু পুল্ টুগেদার্ অ্যান্ড্ ওয়ার্ক হার্ডার্ দ্যান্ এভার বিফোর টু রিয়্যালাইজ ন্যাশানাল্ গোলস্।”

ঠিক এই কথাই দিল্লীর লালকেল্লার সামনের ময়দানে, হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় শীতে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে শুনেছিলাম সুদর্শন রাজীবের সুদর্শন দাদুর মুখে। এখন ভাবনার বিষয় হচ্ছে এইই যে এই কথা, আপনার আমার ন্যাংটো নাতিরাও কি শুনবে? ততদিনে হাফ-প্যান্টও তো থাকবে না তাদের পরনে।

গ্রীক দার্শনিক আইসোক্র্যাটস্ বলেছিলেনঃ “ডীপ্-সীটেড্ লাস্ট ফর্ পাওয়ার্ ইজ দ্যা উইকেড হার্লট্ হু মেক্‌স্ সিটি আফটার্ সিটি ইন্ লাভ উইথ্ হার্ টু বিট্রে দেম্ ওয়ান্ আফটার্ অ্যানাদার্ ট্যু দেয়ার্ রুইনস্।”

সেই গভীরে-প্রোথিত কামনা ক্ষমতারই হোক, গদীরই হোক আর যশেরই হোক একই প্রভাব তার সমাজের, দেশের উপরে!

আমাদের বাঘা-বাঘা বুদ্ধিজীবীরাই বা কী করছেন? এখনও শুধু

আর্টফিল্ম বানিয়ে যাচ্ছেন ? যে-সব ফিল্ম-এ ডিটেইলসের কাজ চমৎকার থাকে ? জামদানী শালের জমকালো পাড়, অ্যান্টিক ফার্ণিচার, লং শট ? স্মিতা পাতিলের মুখ ? যে আর্ট, যে সাহিত্য, যে আর্ট-ফিল্ম দেশের হতভাগ্য নিবানব্বুই ভাগ মানুষের কিছুমাত্র কাজে আসে না, চরম সংকটের সময়ও তাঁদের শিল্পীসত্তা যদি চুপ করে থাকে তবে ইতিহাস কি বলবেন তাঁদের সম্বন্ধে ?

আমি তো "অপসংস্কৃতির কাগজ" আনন্দবাজার গোষ্ঠীর লেখক। প্রকৃত কট্টর—বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা কি করছেন ? অথবা না-বাম, না-ডান অথবা নিজের নানাবিধ ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য দু পক্ষেরই আঁচল-ধরা যাঁরা। তাঁরা ?

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গানের কথা মনে এলো। বাঙালী কি রবীন্দ্রনাথকেও ভুলে গেলেন ?

"আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা ?
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস, কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে গভীর মরমবেদনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা ?
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি
—মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ লয়ে, মিছে কাজে নিশিযাপনা !
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ
—কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে সকল প্রাণের কামনা ?
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা ?
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।"

"যশের কাঙালীতে" এই বঙ্গভূমি ছেয়ে গেছে এখন। "হাসি-খেলা আর প্রমোদের মেলার" উইয়ের ঢিপিতে পদাঘাত করলেই দেখা যাবে তাঁদের অনেকেরই যশ ঝুরো মাটি হয়েই ঝড়ে পড়ছে।

জন স্টুয়ার্ট মিল, তাঁর পৃথিবীবিখ্যাত রাজনৈতিক দর্শনের প্রবন্ধ 'অন লিবার্টি'তে বলেছিলেন :

"লাইক আদার টাইর‍্যানীজ, দ্যা টাইর‍্যানী অফ দ্যা মেজরিটি ওজ অ্যাট ফার্স্ট, এণ্ড ইজ স্টিল ভালগারলি, হেল্ড ইন ড্রেড চিফলি অ্যাজ ওপারেটিং থ্রু দ্যা অ্যাক্টস অফ দ্যা পাবলিক অথরিটিজ্। বাট রিফ্লেক্টিং পার্সনস পারসিভড্ দ্যাট হোয়েন সোসাইটি ইজ্ ইটসেল্ফ দ্যা টাইর‍্যান্ট-সোসাইটি কলেক্টিভলি ওভার দ সেপারেট ইণ্ডিভিজুয়াল্‌স্ হু কম্পোজ ইট—ইটস মীনস অফ টাইর‍্যানাইজিং আর নট রেস্ট্রিক্টেড টু দ্যা অ্যাক্টস হুইচ ইট মে ডু বাই দ্যা হ্যাণ্ডস অফ ইটস পোলিটিকাল ফাঙ্কশানারিজ্। সোসাইটি ক্যান অ্যাণ্ড ডাজ এক্জিকিউট ইটস্ ওওন ম্যানডেটস্ ; অ্যাণ্ড ইফ ইট ইজ ইস্যুয়িং রং ম্যানডেটস্ ইনস্টেড অফ রাইট, অর এনি ম্যানডেটস্ অ্যাট ওল ইন থিংগস উইথ হুইচ ইট ওস্ নট টু মেডল্, ইট প্র্যাকটিসেস্ আ সোশ্যাল টাইর‍্যানী মোর ফরমিডেবল্ দ্যান মেনি কাইণ্ডস্ অফ পোলিটিকাল অপ্রেশান, সিন্স, দো নট ইউজুয়ালি আপহেল্ড বাই সাচ এক্সট্রীম পেনাল্টিজ, ইট লিভস্ ফিউয়ার মীনস অফ এসকেপ, পেনিট্রেটিং মাচ মোর ডীপলী ইনটু দ্যা ডিটেইলস্ অফ লাইফ, এণ্ড এনস্লেভিং দ্যা সোল ইটসেল্ফ।"

আমাদের এই বৃহৎ গণতন্ত্রে এই জিনিসই ঘটছে। যেহেতু যা কিছু কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার করছেন তার পিছনে 'মেজরিটির' তক্‌মা আছে যে-কেউই এর প্রতিবাদ করবেন তাকেই যেন-তেন-প্রকারেণ শায়েস্তা

করতে চান এঁরা। এঁরা চল্লিশ বছরে একবারও ভাবেননি এই কথাটা যে "দ্যা স্ট্রেন্থ অফ আ চেইন ইজ ইটস্ উইকেস্ট লিংক।"

জন লকও তাঁর পৃথিবীবিখ্যাত রাজনৈতিক দর্শনের প্রবন্ধ 'সিভিল গভর্ণমেণ্ট'এর "অফ দ্যা এণ্ডস্ অফ পোলিটিক্যাল সোসাইটি এণ্ড গভর্ণমেণ্ট" অধ্যায়ে বলেছিলেন :

"বাট দো মেন হোয়েন দে এণ্টার ইনটু সোসাইটি গিভ্ আপ দ্যা ইকুয়ালিটি লিবার্টি এণ্ড এক্জিকিউটিভ পাওয়ার দে হ্যাড ইন দ্যা স্টেট অফ নেচার ইনটু দ্যা হ্যাণ্ডস অফ দ্যা সোসাইটি, টু বী সো ফার ডিসপোজড অফ বাই দ্যা লেজিসলেটিভ অ্যাজ দ্যা গুড অফ দ্যা সোসাইটি শ্যাল রিকুয়ার; ইয়েট ইট বীইং ওনলী উইথ অ্যান্ ইনটেন্শান্ ইন এভরীওয়ান্ দ্যা বেটার টু প্রিসার্ভ হিমসেল্ফ, হিজ অ্যাবিলিটি এণ্ড প্রপার্টি (ফর নো র‍্যাশানাল ক্রীচার ক্যান বী সাপোজড টু চেঞ্জ হিজ কণ্ডিশান উইথ অ্যান ইনটেন্শান টু বী ওয়ার্স্) দ্যা পাওয়ার অফ দ্যা সোসাইটি, অর লেজিসলেটিভ কন্স্টিট্যুটেড্ বাই দেম, ক্যান নেভার বী সাপোজড্ টু এক্সটেণ্ড ফারদার দ্যান দ্যা কমোন গুড, বাট ইট ইজ ওবলাইজড্ টু সিকিওর এভরীওয়ান্স্ প্রপার্টি বাই প্রোভাইডিং এগেইনস্ট দোজ থ্রী ডিফেক্টস অ্যাবাভ-মেনশানড্ দ্যাট মেড দ্যা স্টেট অফ নেচার সো আনসেফ এণ্ড আন্ইজী। অ্যাণ্ড সো হাওয়েভার হ্যাজ দ্যা লেজিসলেটিভ অর সুপ্রীম পাওয়ার অফ এনা কমোনওয়েল্থ ইজ বাউণ্ড টু গভার্ন্ বাই এস্টাব্লিশড স্ট্যাণ্ডিং লজ, প্রমালগেটেড অ্যাণ্ড নোন টু দ্যা পীপল, অ্যাণ্ড নট বাই এক্সটেম্পোরারী ডিক্রীজ; বাই ইনডিফারেন্ট এণ্ড আপরাইট জাজেস, হু আর টু ডিসাইড কনেট্রাভারসীস বাই দোজ লজ; অ্যাণ্ড টু এমপ্লয় দ্যা ফোর্স অফ দ্যা কম্যুনিটি অ্যাট হোম ওনলী ইন্ দ্যা এক্জিকিউশান অফ সাচ লজ, অর অ্যাব্রড, টু প্রিভেণ্ট অর রিড্রেস ফরেন ইনজুরিজ অ্যাণ্ড সিকিওর দ্যা কম্যুনিটি ফ্রম ইনরোডস্ অ্যাণ্ড ইনভেশান্। অ্যাণ্ড ওল দিস টু বী ডায়রেক্টেড টু নো আদার এণ্ড বাট দ্যা পীস, সেফটি এণ্ড পাবলিক গুড অফ দ্যা পিপল্।"

কিন্তু এই চল্লিশ বছরের পর আমরা কি দেখছি? বিচার ব্যবস্থা এবং বিচারকদের পুরোপুরি কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। গণতন্ত্রর মূল কথা হচ্ছে "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ দ্যা জুডিসিয়ারি"। বিচারকরাই, প্রশাসনের অন্যায়কে শক্ত হাতে দমন করবেন। অন্য বিচারকদের কথা ছেড়েই দিলাম। সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্ট এর বিচারপতিদের যে মাস-মাইনে সরকার দিয়ে এসেছেন তাতে এই লম্ফমান মুদ্রাস্ফীতির যুগে তাঁদের পক্ষে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করাই অসম্ভব। তার উপর প্রশাসন তো পরোক্ষে সব কলকাঠিই নাড়ছেন। এ দেশে সবচেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধা, ভি-আই-পি ট্রিটমেন্ট, পাঁচ-বিঘা দশ-বিঘার উপরে শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাংলো জনগণের নির্বাচিত মানুষেরাই পান। তাঁদের অধিকাংশর জীবন যাত্রা ও আর্থিক অবস্থা যেরকম, যা রাজনীতির "পেশা"র মাধ্যমেই অর্জিত; তার সঙ্গে দেশের নব্বুই ভাগ মানুষের জীবনযাত্রার কোনো সাযুজ্যই নেই। যে বিচারপতিই সরকারবিরোধী রায় দেন তিনিই "খারাপ" বিচারপতি।

অথচ গণতন্ত্রের পাহারাদার বিচারপতিদেরই হবার কথা ছিলো। তাঁদের উপরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নানারকম পরোক্ষ চাপের সৃষ্টি করে রেখে গণতন্ত্রর মূল গুণকে নষ্ট করে দিতে বদ্ধপরিকর। স্বাধীনতার পর যে সংবিধান রচিত হয়েছিলো তার একটি প্রত্যাশাও গত চল্লিশ বছরে পূর্ণ হয়নি। যতটুকু করা হয়েছে তা শুধুমাত্র ভোটের দিকেই চেয়ে। ভোটে হাত যাতে না পড়ে শুধু সেইটুকুই দেখা হয়েছে। ফলে কী বিচার-ব্যবস্থা, কী প্রশাসন, কী দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সবই ভেঙে পড়ারই মত হয়েছে। জনসংখ্যা, যা ভারতের মূল সমস্যা তা নিয়ন্ত্রণে কখনওই লোক-দেখানো প্রচার ছাড়া আর কিছু করা হয়নি। দেশের যা অবস্থা তাতে প্রয়োজন হলে বাধ্যতামূলকভাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করানো উচিত। ইন্দিরা গান্ধী অনেক দেরী করে হলেও একবার চেষ্টা করে-ছিলেন উঠে পড়ে কিন্তু পরে ঐ কারণেই তিনি গদী হারালেন। "গদী হারানো"র কথা কোনো রাজনৈতিক দলই ভাবতে পর্যন্ত পারেন না। তাতে দেশের সর্বনাশই হোক আর যাইই হোক। প্রচণ্ড ধনী অথবা

অতি গরীব কোনো কোনো গোষ্ঠী জন্মনিয়ন্ত্রণ করেন না। একাধিক বিবাহতে বাধা নেই বলেও কোনো কোনো গোষ্ঠী যে হারে সংখ্যাবৃদ্ধি করছেন তাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে তাঁরাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আসবেন। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সন্দেহ নেই। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে ভারতের স্বাধীনতার বীজের মধ্যেই ধর্মান্ধতা ছিলো সুপ্ত। এই কারণেই পাঞ্জাব আর বাংলাকে দুভাগ করা হয়েছিলো। জিন্নাসাহেব পাকিস্তান চেয়েছিলেন এক বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের জন্যেই। তাঁদের জন্যেই পৃথক রাষ্ট্রর দাবী করেছিলেন তিনি। এবং নেহেরু সাহেব সে দাবী মেনে নিয়েছিলেন প্রথমে গান্ধীজীর আপত্তি সত্ত্বেও। নইলে তিনিও বা কি করে প্রধানমন্ত্রী হন? ক্ষমতার চেয়ে বড় লোভ আর কিছু নেই। এবং আমরা জানি যে "পাওয়ার করাপট্স্ এ্যাণ্ড এ্যাবস্যুলিউট্ পাওয়ার করাপট্স্ এ্যাবস্যুলিউটলি।"

স্বাধীনতার সময়ে যখন অখণ্ড স্বাধীনতা পাওয়া গেলো না জিন্নাসাহেবের ধর্মান্ধতার জন্যেই, তখন ভারতবর্ষকে অন্য পাকিস্তান হতে দেওয়া কোনো ভারতীয়র পক্ষেই বরদাস্ত করা অনুচিত। এই দেশ, আন্তর্জাতিক নেহেরু পরিবার এবং তাঁদের পেছনে তালি-বাজানো মোসাহেবি-করা, দুর্নীতিগ্রস্ত, একদল মেরুদণ্ডহীন মানুষের যতখানি, আমার এবং আপনারও ঠিক ততখানিই। এক্ষুণি এ নিয়ে সোচ্চার না হলে পরে আর সময় থাকবে না।

কাশ্মীরের জন্যে আজ পর্যন্ত কত লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়েছে? কিন্তু কি লাভ হয়েছে? যাঁরাই কাশ্মীরে গেছেন তাঁরাই দেখেছেন কাশ্মীরীদের একাংশ 'রেডিও পাকিস্তান' ছাড়া কিছু শোনেন না। সাম্প্রতিক অতীতে একটি ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ খেলার সময় (তাও পাকিস্তানের সঙ্গে নয়) কিছু কাশ্মীরীর ব্যবহার দূরদর্শনের পর্দায় কি আপনারা দেখেননি? ভুলে গেছেন ইতিমধ্যেই? একাংশ কাশ্মীরী মনে-প্রাণে পাকিস্তানী। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগলে তাঁদের অনেকেই অন্তর্ঘাতে লিপ্ত হবেন।

আপনারা কি জানেন যে কাশ্মীর; ভারতের পরম আদরের

রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ যেমন অনাদরের রাজ্য ; সেই কাশ্মীরে কোনো অ-কাশ্মীরীর কোনো সম্পত্তির মালিকানার অধিকার নেই? এ কোন্ স্বপ্নরাজ্যে বাস করছেন ভারতের নেতৃত্ব? তাঁরাই তো দেশে বিভেদ এবং সন্ত্রাসের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। চোখ বন্ধ করে, কেন্দ্রের শাসন কায়েম রাখার জন্যে কাশ্মীরকে চল্লিশ বছর ধরে তোয়াজ করে চলেছেন। কাশ্মীরে যে টাকা খরচ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে প্রতিরক্ষার কারণে এবং আরও নানা তোষামোদির কারণে তার একাংশও পশ্চিমবঙ্গের জন্যে খরচ করা হয়নি। হলে, পশ্চিমবঙ্গের এই দুরবস্থা হতো না।

সাধারণ কাশ্মীরী মানুষ বড়ই গরীব। তাঁদের প্রধান রোজগার গরীব বাঙালা ভ্রমণার্থীদেরই খরচ করা টাকা। সব কাশ্মীরীর বিরুদ্ধে আমার একটুও দ্বেষ নেই। কিন্তু যাঁরা ভারতে বাস করে পাকিস্তানকে মদত দেন, সাহায্য করেন; তাঁরা দেশদ্রোহী। তাঁদের সেই ভাবেই দেখা উচিত। ফারুক আবদুল্লার সঙ্গে "দ্যা টেলিগ্রাফের" এডিটর এম. জে. আকবর-এর বাড়ির এক পার্টিতে আমার আলাপ হয়েছিলো। বিলেতে শিক্ষিত ডাক্তার। সপ্রতিভ। শিক্ষিতদের মধ্যে ধর্মান্ধতা থাকার কথা নয়। থাকলে তো শিক্ষাই অসার। তাই আশা করব ফারুক কাশ্মীরীদের বোঝাবেন যে ভারতে থাকতে হলে ভারতীয় হয়েই থাকতে হবে। অন্য কোনো উপায় নেই।

এ কথা ঠিক যে, কাশ্মীরও দুভাগ হয়েছিলো। কিন্তু তা যুদ্ধে। ভারতীয় সেনাবাহিনী পুরো কাশ্মীরই নিয়ে নিতে পারতো সহজেই। মাঝপথে বাধা দিয়ে তখন তা বন্ধ করেছিলেন কেন্দ্র। ধর্ম-নিরপেক্ষতা প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষেরই কাম্য কিন্তু যে ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতি সংখ্যাগরিষ্ঠদেরই নিকৃষ্ট করে রাখে, তাদের প্রতিনিয়ত সংখ্যালঘুদের দিকেই ঠেলে দেয় তা কোন্ দেশী নিরপেক্ষতা? সাহস নেই কি কারোই সত্যি বলবার?

যদি কোনো ধর্মাবলম্বীরা ধর্মান্ধ হন তবে তাদের কি ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশে মদত পাওয়া উচিত? কিন্তু একথা বললে আপনাদেরই

বলতে হবে। ভোটেরই মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক ভোটের ক্ষতি হয়ে যাবে এমন সব সত্য ও জাজ্বল্যমান সমস্যার মুখোমুখী হলে। হবে রাজ্য সরকারেরও। এমন বিপদ কি কোনো দল তাদের মাথায় ডেকে আনতে পারে? আপনারা দুবার তিনবার উদ্বাস্তু হয়েছেন তো কি হয়েছে? না হয় আরেকবার হবেন, নিজ রাজ্য থেকেও। তাতে ভোট-প্রাণ সরকারের কিছুমাত্র যাবে আসবে না। কিন্তু এই অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন দলগুলি একদিন এই সত্যকে মানতে বাধ্য হবে যখন নিজেদের গদীতেই টান পড়বে।

মহত্বর ভান এক কথা আর মহত্ব অন্য। শাহবানুর মামলার সময় কি হলো তা আপনারা দেখেননি? প্রগতিশীল, ধর্মান্ধ নন: এমন অসংখ্য শিক্ষিত মুসলমানদের আপত্তি সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার যা করবার তা করলেনই। না করে উপায় কি? পাঁচ বছর পর যে নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে। অতগুলো ভোট হারাবার সাহস কি ওঁদের আছে? কিন্তু অতগুলো ভোট বাড়তে বাড়তে যেদিন এমন সংখ্যায় পৌঁছবে যখন ভোটের জোরেই তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত হতে হবে সেদিন দেখবেন ওঁরা (যদি তখনও ক্ষমতাসীন থাকেন) কী করেন! তখন আমি এখন যা বলছি, তাইই সত্যি হবে।

বাংলার মুসলমানেরা অধিকাংশই শিক্ষিত, উদার—মতাবলম্বী। ধর্মান্ধতায় তাঁদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেন না। বাঙলা ভাষার বাঁধন হিন্দুমুসলমান সকলের কাছেই মস্ত বড় বাঁধন। তাছাড়া বাঙালী মুসলমানদের একটি মস্ত বড় অংশর সৃষ্টিও তো উচ্চবর্ণ-হিন্দুদের অত্যাচার, অমানুষিক খারাপ ব্যবহারের ফল। এ কথা যে বাঙালী হিন্দু অস্বীকার করেন, হয় তিনি অজ্ঞ অথবা মিথ্যাবাদী। বাঙালী বাঙালীই। বাংলাদেশের হিন্দুমুসলমান বাঙালীরাও যতখানি বাঙালী, পশ্চিমবঙ্গর হিন্দু ও মুসলমানেরাও তাইই। অত্যন্ত সুখের কথা এইই।

'বাংলাদেশের' প্রসব যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সেই 'বাংলার বাঙালীরা প্রমাণ করেছেন বুকের রক্ত আর অগণ্য নারীর সম্মান দিয়ে যে তাঁরা

আমাদের এই বাংলার বাঙালীদের মতো মেরুদণ্ডহীন, কাল-ঘুমে পাওয়া প্রজাতি নন। তাঁদের প্রত্যেককে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। স্থায়ী স্বাধীনতা, বোধহয় রক্ত দিয়েই পেতে হয়। পৃথিবীর ইতিহাস তাইই বলে। ছাগলের দুধ. চরকা-কাটা. অহিংসা, আর বাগ্মীতার মধ্যে দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এসেছিলো বলেই তার রকমটাও জোলা-দুধেরই মতো বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানীদের প্রকৃতি এবং চরিত্র যেহেতু রক্ত ও অসম্মানের বিনিময়েই জেনেছেন, আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনারা তাঁদের কাছে যাচাই করে নিতে পারেন এই কথার সত্যাসত্য।

পাকিস্তানে যদি হিন্দুদের ধর্মর কারণে মাথা হেঁট করে মনুষ্যেতর জীবন যাপন করতে হয় নয়তো ভিটেমাটি ছেড়ে চলেই আসতে হয়, তবে ভারতবর্ষর মুসলমানেরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কারণে, তাঁদের নিজেদেরই বৃহৎ ভবিষ্যৎএর কারণে কেন এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করবেন না? দেশের স্বার্থে যা-কিছুই করা দরকার তাইই দেশপ্রেমর কাজ। না-করাটাই দেশ-দ্রোহীতা।

জেলে যাবার বা মরবার ভয় প্রাণে থাকলে এত কথা বলতে বসতাম না। আমি আশা করব যে, আমি যদি নাও থাকি বা জেলে থাকি তাহলেও আপনাদের শুভবুদ্ধি বা বিবেক যা বলবে তাইই করবেন আপনারা এই বাবদে। সোডার বোতলের গুণাগুণ বর্জন দিয়ে এবার স্মৃতিকে আপনারা একটু প্রখর করুন। মেরুদণ্ড টান-টান করে দাঁড়ান। নজরুলের কবিতার কথা স্মরণ করুন—

"বল বীর
বল উন্নত মম শির!
শির, নেহারী আমারি, নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রির"।

রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারার ধনঞ্জয় বৈরাগীকেও এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন আপনারা? বলুন "তোদের শিকল আমায় বিকল করবে না।" চোখের দৃষ্টি প্রখর করুন, পথে-ঘাটে যেখানেই অন্যায় বা অবিচার দেখবেন তার প্রতিবাদ বা প্রতিকার করুন। আপনাদের নির্বাচিত

সরকারের হাত-পা-চোখ-কান তো আপনারাই। দেশের সব সমস্যাই রাজীব গান্ধী বা জ্যোতি বসু ব্যক্তিগত ভাবে সমাধান করবেন এমন ভেবে বসে তাস খেলবেন না বা পরনিন্দা-পরচর্চায় মশগুল হবেন না। পথে ঘাটে, ট্রামে-বাসে, ট্রেনে-স্টেশনে, অফিস-কাছারীতে, এয়ারপোর্টে প্লেনে যেখানেই অন্যায় দেখবেন তার প্রতিবাদ করবেন। একবার একক কণ্ঠে প্রতিবাদ করে দেখুন, দেখবেন আপনার অজানিতে অনেক মানুষই নিঃশব্দ পায়ে আপনার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সবাই প্রতিবাদ করে। যন্ত্রণায় গুমরোয়। কিন্তু সকলেই মুখে সেই কথা বলে না। আপনি তাঁদের 'মাউথপিস্' হোন। যদি আপনার পেছনে কেউ না দাঁড়ায়, বা দাঁড়ালেও কোনো বিশেষ এলাকাতে আপনাদের অপমানিত বা নিগৃহীত হতে হয় তবে পুলিশের কাছে যান। সব পুলিশই দুর্নীতিগ্রস্ত একথা ভুল। তাছাড়া আপনারা যদি সকলে মিলে যান, ভদ্রভাবে আপনাদের মনের দৃঢ়তার কথা এবং আপনারা যে ন্যায়ের জন্যেই লড়ছেন এই কথা বলেন তবে পুলিশ আপনার কথা শুনবেই। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ভারতের অন্য অধিকাংশ রাজ্যের পুলিশের চেয়ে অনেকই ভালো। আর দুর্নীতির কথা যদি বলেন তাহলে নিজেরাও একবার আয়নার সামনে দাঁড়াবেন। দুর্নীতি, চোরা-কারবার, অনিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অভদ্রতা এখন কোথায় নেই? দুর্নীতির জনক দিল্লী। ভোটের—কারবার। এই অসহনীয় মুদ্রাস্ফীতির মূলেও এই দুর্নীতি। স্নেহ যেমন নিম্নগামী, দুর্নীতিও তাইই। দিল্লী থেকে সমস্ত রাজ্যে দুর্নীতি ছড়িয়েছে। এখন বোতল-ছাড়া দৈত্যকে বোতলে ভরার সাধ্য তাঁদের নেই। সে সাধ্য আপনাদের আছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। 'প্যারালাল ইকনমির' খেলা বন্ধ করুন। দেখবেন, মুদ্রাস্ফীতি কমে গেছে। আপনার রোজগারের মধ্যেই আপনার কুলিয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রধান শরিক আপনি। হাল ছেড়ে দেবেন না অন্যের হাতে। আপনার নিজের মাস-মাইনেতে আপনি যদি কুলোতে না পারেন পুলিশের কর্মচারীরাই বা কি করে পারবেন? ঐ মাইনেতে কারোই সংসার চলে না।

কিন্তু চলে না বলে কি আপনি সর্বক্ষণই অন্যায় করছেন? আপনি নিজে? পৃথিবীর খারাপতম লোকের মধ্যেও ভালো দিক থাকেন। একজন নীতিবাগীশ, সৎ; ন্যায়পরায়ণ মানুষ থাকেন। একজন মানুষ অনেকগুলি খণ্ড-মানুষেরই সমষ্টি। সেই কালো খণ্ডর কাছে আপনার খণ্ড ভালোত্ব নিয়ে নালিশ করুন দেখবেন ফল পাবেন। নিজের দেশের সাধারণ মানুষ, প্রশাসনের লোকজন, পথের লোকজনেব উপরে বিশ্বাস রাখবেন। স্বাধীনতার পরে ভারতের মানুষ যে এতখানি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে আমি তাকে ভালো বলছি না, বলছি এই দুর্নীতির শিকড় খোঁজার চেষ্টা করুন। উপায় থাকলে, ভদ্রভাবে, সৎভাবে, সমাজে, পাড়ায়, গ্রামে, মাথা উচু করে, নিজের স্ত্রী সন্তানদের কাছে মুখোজ্জ্বল করে কার না সৎ হয়ে বাঁচতে ইচ্ছে যায়? এই অবস্থা, দেশবিভাগ, কেন্দ্রের উদাসীনতা, রাজ্য সরকারের নিস্পৃহতার জন্যেও। যে কর্মচারীরা দু হাজার টাকা মাইনে পান তাঁদের মাইনে বাড়াবার জন্যে বামপন্থীরা 'সংগ্রাম' করেন। ট্রামের ভাড়া, রাজ্যে তাঁদের কর্তৃত্ব না-থাকার সময় এক পয়সা বাড়লেই তাঁরা আন্দোলনে নামেন গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতা করে। তাঁদের চেয়ে অনেক কম মাইনে-পাওয়া লক্ষ লক্ষ বাড়ি-ফেরা অফিস-যাত্রীর চরম দুর্ভোগ ঘটিয়ে মিছিল বের করেন। সকলের প্রতিই তো দরদ থাকবে!

অথচ যখন অবাঙালী ব্যবসায়ীরা (তাঁরাই তো বাংলার নব্বুই ভাগ), যখন একজনও বাঙালী ছেলেকে চাকরী দেন না, যখন পথে মানুষ মরে পড়ে থাকে, যখন রাজপথকে মনে হয় দুর্গম গিরিপথ, তখন তাঁরা নির্বাক থাকেন। কলকাতার অস্থাবর সম্পত্তির ছিয়াত্তর ভাগ যখন অবাঙালীর হাতে চলে গেছে, গাড়ির নব্বুই ভাগেরও বেশি, তখনও তাঁরা "বাঙালী-অবাঙালী সম্প্রীতি অটুট থাক" বলে দেওয়ালে নির্বাচনী প্রচার চালান।

সম্প্রীতি? কিসের সম্প্রীতি? ভোট পাওয়ার বাহানা! পার্টি-ফাণ্ডে মোটা টাকা তোলার ক্রিয়া-কাণ্ড। বামফ্রন্ট সরকারের অবাঙালী-শোষণ নীতি, যে নীতি বাঙালী জাতকে ডেইলী-প্যাসেঞ্জারের জাতেই

রূপান্তরিত করেছে ; তার মূলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাশ্মীরী প্রেমেরই মতো এক প্রেম কাজ করে। ভোটের প্রেম।

না। আপনারা ভুলেও ভাববেন না যে আমি আপনাদের অবাঙালীদের বিরুদ্ধে খেপাচ্ছি। আমি তেমন ক্ষুদ্রমনা নই। বাংলাতে বাঙালী-অবাঙালী চিরদিনই সম্প্রীতির সঙ্গে বাস করেছে। কিছু কিছু অবাঙালী ব্যবসায়ী বাংলাকেই তাঁদের নিজের দেশ করে নিয়েছেন এবং বাংলার জন্যে এমন কিছু করেছেন যা বাঙালীরা করেননি। যেমন বিড়লা-পরিবার। তাছাড়া আমি এই দেশের কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, মহারাষ্ট্র থেকে আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড মেঘালয় এবং প্রত্যেক রাজ্যে গেছি। সমগ্র ভারতবর্ষ, অখণ্ড ভারতবর্ষই আমার স্বপ্ন। বাংলার বাইরের বিভিন্ন রাজ্যে অসংখ্য বাঙালীরা বাস করেন তাঁদের কথাও মনে রাখবেন। আপনারা কারো প্রতিই অন্যায় করবেন না। তাহলে সেই অন্যায়ের ঢেউ আপনার আত্মীয় পরিজনের গায়েই গিয়ে আছড়ে পড়বে। কিন্তু তা বলে অন্যায় সহ্যও করবেন না। নিজেরা ন্যায্য হলে, বিবেকের কাছে পরিচ্ছন্ন থাকলে, বাঙালী, যে জাত সবচেয়ে উদারমনস্ক, সহৃশীল, ভারতের অন্যতম শিক্ষিত প্রজাতি, তাদের গায়েই কলঙ্ক লাগবে। যে সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে বলছি তা এইরকম।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলছি কয়েকটি।

আমার একজন অবাঙালী মক্কেলকে ডেকে আমি গতমাসে বললাম যে একটি বাঙালী ছেলে বি. কম. এ ভালো ফল করেছে, বাবা রিটায়ার করেছেন, দুটি অবিবাহিত বোন আছে ; তাকে একটি চাকরী দেবেন অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে ?

উনি আমার মুখের উপর বললেন, না। গুহ সাহেব, বাঙালী ছেলে নেবো না।

কেন নেবেন না ?

"বাঙালী কাজ তো করেই না উপরন্তু একমাসের মধ্যে ইউনিয়ন বানায়।"

কথাটা অসত্য নয়। বাঙালীর কাজ না করার দুর্নাম এবং ইউনিয়ন বানানোর দুর্নামের পেছনের কৃতিত্ব অনেকখানি বামফ্রণ্ট সরকারেরই। তাঁরা বাঙালীর এই ইমেজই গড়ে তুলেছেন তাঁদের ভুল ট্রেড-ইউনিয়ন রাজনীতির কারণে। এই বদনামকে আপনাদেরই দূর করতে হবে। আমার জানা বহু বাঙালী প্রতিষ্ঠান, যাঁরা শুধুমাত্র বাঙালী কর্মচারীই নিয়েছিলেন বাঙালী প্রীতির জন্যে তাঁরা ডুব্তে ডুব্তে বেঁচে গেছেন। এবং অনেকে ডুবেও গেছেন আমার জানা অনেক অবাঙালী ব্যবসায়ী, যাঁরাও বাঙালী প্রীতির জন্যে শুধুমাত্র বাঙালী কর্মচারীই নিয়েছিলেন তাঁরাও অধিকাংশই ডুবে গেছেন। কম্যুনিজম বা সোশ্যালিজম এর তত্ত্বর কিছু কিছু সকলেরই জানা আছে। কিন্তু এঁরা রাশ্যান বা চীনা 'ইজম্' এর ইজম্টুকুই নিয়েছেন, কর্মচারীদের কাজ করতে বলেননি কখনও। ছাত্রদের লেখাপড়া করতে বলেননি। পরীক্ষা সময়ে নেননি, স্কুলে কলেজে লেখাপড়া ঠিক হচ্ছে কি হচ্ছে না তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা দেখাননি, টোকাটুকি বন্ধ করেননি. ঠিক সময়ে খাতা দেখার ওপর জোর দেননি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্ববিদ্যালয়কে বছরের পর বছর অকেজো করে রাখতে দিয়েছেন, ধাঙর বা ওয়ার্ডবয়দের জুলুমকে জোরদার করতে আস্কারা দিয়ে ডাক্তারদের কাজ করতে দেননি, হাসপাতালে রোগীর সুষ্ঠু চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেননি, চুরি বন্ধ করতে পারেননি, পথঘাট থেকে আবর্জনা সরাতে পারেননি, পথঘাট ধোওয়ার কোনো বন্দোবস্ত করেননি, রাস্তার হাইড্রানেটে জল যাতে থাকে, আগুন লাগলে যাতে আগুন নেভানো যায় তার বন্দোবস্ত করেননি, অথচ পুরমন্ত্রী কর্পোরেশান ট্যাক্স যে হারে বাড়িয়েছেন তাতে কোনো মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষেই কলকাতায় থাকা আর সম্ভব নয়। ট্যাক্সি, মিনিবাস, ডাবলু-বি-ওয়াই নাম্বারের গাড়ি, বাস যেভাবে রাজ্যর পথে চলে তাতে প্রতিদিনই মারা যাচ্ছে বহু লোক তা নিয়েও বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাননি! কলকাতার স্টেটবাসের সঙ্গে বম্বে-দিল্লীর স্টেটবাসের তুলনা করতে লজ্জা হয়! অথচ তাঁরাই নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন খাতে দেয় টাকা খরচ করতে না পেরে

বছবের পর ফিরিয়ে দিয়েছেন। কথাটা সত্যি হলে, বিস্ময়ের!

এও শুনতে পাই কলকাতার জন্যে তাঁদের কোনো মাথাব্যথা নেই কারণ গ্রামে তাঁরা বিভিন্ন উপায়ে তাঁদেব ভোট পাবার পাকা-পোক্ত বন্দোবস্ত করে রেখেছেন! পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে পঞ্চাশ মাইল বাসে করে গেলেও আপনি একটিও সরকারী ডাকবাংলো পাবেন না যে বাস খারাপ হলে বা মেয়েরা বাথরুমে যেতে চাইলে আপনি সেখানে থামতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের ট্যুরিজম-বিভাগ চালিত যে-কটি পান্থনিবাস আছে তার মতো নোংরা, আভ্যন্তরীন শ্রীহীন, অব্যবস্থাপনায় ভরা পান্থনিবাস ভারতের অন্য কোনো রাজ্যেই নেই। লোকজন সবই আছে জমাদার আছেন তাঁরা কাজ করেন না। ম্যানেজার আছেন; তাঁরা মনে করেন ভ্রমণকারীদের তাঁরা কৃতার্থ করছেন। সামান্য মেরামতীর জন্যে ম্যানেজারেরা কলকাতায় লিখে লিখে হয়রান হয়ে যান! এসব লজ্জা সবকারেরই। যদি লজ্জাবোধ তাঁদের থাকে!

বামফ্রন্ট সরকার একথাও ভুলে যান যে কলকাতাই সারা বাংলার মস্তিষ্ক। গ্রামের মানুষও আজকাল লেখাপড়া জানেন। তাঁরাও বই পড়তে পারেন। তাঁদের পক্ষে যা পরম মঙ্গলময় বলে সরকার মনে করেন তাই একমাত্র মঙ্গল নয় সে কথা তাঁরাও বোঝার চেষ্টা করতে পারেন।

অন্য কথাতে এসে গেলাম। পশ্চিমবঙ্গে এই যে অবাঙালী ব্যবসাদারদের রবরবা তাতে বাঙালীর কি লাভ হয়েছে? আমি বিহারের জামসেদপুরের আদিত্যপুব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের একটি কারখানার ডিরেক্টর ছিলাম গোড়ার দিকে কিছুদিন। কারখানা পত্তনের সময় প্রতি সপ্তাহে টাটাতে গিয়ে থাকতে হতো।

কারখানাটি ছিলো আর্ক ফার্নেস্ এর। হাওড়া থেকে দক্ষ কারিগরদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। কিন্তু কারখানা চালু করা গেলো না কারণ স্থানীয় যুবকেরা এসে বললো শতকরা চল্লিশ ভাগ লোক স্থানীয় লোক নিতে হবে। 'সানস্ অফ দ্যা সয়েল'। তাই

নিতে হয়েছিলো নইলে কারখানা চালুই করা যেতো না। অথচ কাজে এরা হাওড়ার কারিগরদের যোগ্যতার ধারেকাছেও আসে না। শুনেছি, সে কারখানা এখন বন্ধ।

কলকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গে যেসব কারখানা আছে তার কত শতাংশ শ্রমিক বাঙালী? এই সব কারখানায় উৎপাদিত বেশির ভাগ জিনিস কিন্তু কেনেন শতকরা নব্বুই ভাগ বাঙালীই। পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার কারণে এতবড় 'বাজার' ভারতে খুব কমই আছে। এই সব কারখানায় অফিসে, ব্যবসাতে কাজ করার জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাইরে থেকে আসেন। তাঁরা কোটি কোটি টাকা প্রতিমাসে মানি-অর্ডার করে অন্য রাজ্যে পাঠান। তাহলে এই সব ব্যবসা বা কারখানা বাংলাতে না থাকলে বাঙালীর কোন্ অপকারটা হতো? বরং জনসংখ্যার চাপে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হয়ে গেছে আকাশ-ছোঁয়া। এঁরা বাঙালীকে চাকরী দেন না (বামফ্রন্টকে ধন্যবাদ!) অথচ বাঙালীদের রক্তেই এঁরা পুষ্ট। চাল, ডাল, গম, মশলা, চিনি, চা, গুড়, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবসাব নিয়ন্ত্রক অবাঙালীরাই। গুদামজাত করে দাম বাড়ানোর মূলেও এঁরাই। পরিবহন ব্যবসার পুরোটাই অবাঙালী ব্যবসাদারদের হাতে। তবে এঁরা বাংলায় ব্যবসা করলেন কি করলেন না তাতে বাঙালীর কি এসে গেলো?

এবারে নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সময় আপনার নির্দল বা দলীয় প্রার্থীকে বলুন স্থানীয় কারখানায় ও ব্যবসাতে বাঙালী ছেলে মেয়েদের কাজ দিতে হবে। শতকরা কুড়ি-ভাগ বাঙালী কর্মচারী নিতে হবে। যারা কাজে যোগ দেবে, তারা যাতে পুরো কাজ করে, কাজে ফাঁকি না দেয় এবং ভুল ট্রেড-ইউনিয়নিজমের নামে উৎপাদনে ব্যাঘাত না ঘটায় তার দায়িত্বও আপনারা নিজেরা নেবেন। যে সরকার এবার পশ্চিমবাংলাতে নির্বাচিত হবেন-সেই সরকারকে বাধ্য করান বাঙালীদের চাকরীর সংস্থান করতে। এছাড়া আপনাদের বাঁচার আর পথ নেই।

"ইণ্ডিয়া ওজ্‌ নেভার কন্‌কারড্‌ ফ্রম উইদাউট : শী ওজ্‌ ডীফিটেড ফ্রম উইদিন। ইট ইজ দ্যা আন একজামিনড্‌ লাইফ দ্যাট লেড টু আওয়ার সাফারিং"

—সগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবের ভাষণে ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ এই কথা বলেছিলেন ১৯৫৪তে।

ভারতই না বাঁচলে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে আমাদের যেমন মাথাব্যথা নেই, তেমন বাংলা না বাঁচলে 'জ্যোতিবাবু', ভারতের দক্ষতম মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়েও আমাদের লাভ কি? বাঙালীকে না মেরে, বাঙালী বাঁচিয়ে যদি তাঁর দক্ষতার নজির তিনি রেখে যেতে পারেন তবেই তিনি বিধানবাবুর মতো মৃত্যুর বহু বছর পরও সম্মানের আসনে আসীন থাকবেন বাঙালীর মনে। দেশে তাঁর কি 'ইমেজ' তার চেয়েও বড় কথা রাজ্যে তাঁর ইমেজ কি? জ্যোতিবাবুরও বয়স হচ্ছে। তাঁরও একথা ভাববার সময় হয়েছে। অবাঙালীদের কাছে জ্যোতিবাবু ভগবান। এবার বাঙালীদের ভগবান হয়ে প্রমাণ করুন যে তাঁর পার্টিকে যেন-তেন-প্রকারেণ জেতাবার চেয়েও বাঙালী জাতকে ভালবেসেই তিনি যথার্থ অমরত্ব লাভে বিশ্বাসী।

আমি যে রাস্তায় থাকি তার মোড়ে একটি পানের দোকান আছে। পথের বাঁ দিকে সেখানে পান খাবার জন্যে গত রবিবারে বাঁ-দিকে গাড়ি দাঁড় করিয়েছি। আমার গাড়ির সামনে আরেকটি গাড়ি ছিলো। এমন সময় সতেরো-আঠারো বছরের একটি অবাঙালী ছেলে

একটি মারুতি গাড়ি নিয়ে সামনের গাড়িটির পাশে ডাবল লাইনে উল্টো দিক থেকে এসে আমার যাবার পথ বন্ধ করে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পানের দোকানে নামলো। আমার পান. দোকানী আমাকে প্রথম দিন থেকে চেনে বলে ; নিজে এসে দিয়ে যায়। পান নিয়ে যেতেই আমি ওকে ভদ্রভাবে বললাম, আপনার গাড়িটা আমার জায়গায় লাগিয়ে দিন ' আমি বেরুবো। ছেলেটি বললো, "আপনার তাড়া থাকলে ব্যাক করে আপনি চলে যান। আই অ্যাম নট ইন আ হারী।" আমার পেছনে আরেকটি গাড়ি ছিলো। কষ্ট করে ব্যাক করে বেরোনো যেতো না এমন নয়। কিন্তু বে-আইনীভাবে রং-সাইডে গাড়ি ডাবল-লাইনে দাঁড় করিয়েও গাড়ি সরাতে সে রাজী নয় বলে আমি ওঁকে আবার বললাম যে, এই কি গাড়ি পার্ক কবার রকম ? তাতে ছেলেটি চোখ রাঙিয়ে বললো, "হ্যাটস্ নান অফ ইওর ব্লাডি বিজনেস্ ।"

বললাম, আপনি কতদিন গাড়ি চালাচ্ছেন ? সে বললো, এবার মুখ বিকৃত করে, "সিন্স ইওর ফাদার ওয়াজ বর্ণ। এণ্ড নাউ ফাক্ ইট অফ্ফ্" . আমার ইচ্ছে হলো নেমে গিয়ে ছেলেটিকে এক চড় মারি। কিন্তু আমি বাঙালী। মারামারি করা আমার মা-বাবা আমাকে শিশুকাল থেকেই শেখাননি মাঝে মাঝে মনে হয় যে শেখালে ভালো করতেন। তবে ব্যাক আমি করলাম না। ও, জোরে গাড়ি চালিয়ে আবারও আমাকে গালাগালি করে চলে গেলে আমি গাড়ি ঘুরিয়ে ওর পিছু নিলাম। আমার রাগটা, বেশির ভাগ বাঙালীর রাগেরই মতো বড়ই দেরীতে চড়লো। কিন্তু গাড়ি ঘুরোতে যতটুকু সময় নিলো ততক্ষণে সেই রাস্তার অনেক ক্রোড়পতির এক ক্রোড়পতির বিরাট বাড়ির অভ্যন্তরে সে সেঁধিয়ে গেছে। তাকে পাওয়া গেলো না। আধঘণ্টা আমার ঘাড়ের কাছে দপ্দপ্ করতে লাগলো।

বুঝলাম, প্রেসার খুব বেড়ে গেছে।

আপনারাই বলুন ? পয়সা আছে, ব্যবসা আছে, কারখানা আছে বলে এবং তাদের বাবা মায়েরা সহবৎ ছাড়া ছেলেদের টাকা রোজগারের সব রকম ধান্দা শেখান বলেই কি আমার ছেলের বয়সী একটি

ছেলে আমাকে অকারণে অপমান করে "ফাক্ ইট অফ্ ফ্" বলে চলে গেলে আমি তাকে মারলে কি অন্যায় করতাম? এদের এত বাড বেড়েছে কাদের আস্কারাতে? এরা জানে যে পকেট ভর্তি টাকা থাকলে পশ্চিমবঙ্গে যে-কোনো বাঙালী ভদ্রলোককে অপমান করা যায়। যে-কোনো আইন লঙ্ঘন করা যায়। যে-কোনো মেয়েকে অপমান করা যায়। করে, সহজেই পার পাওয়া যায়।

আমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন সবাই উদ্বাস্তু। কেউ কেউ দুবার উদ্বাস্তু। যদিও আমার জন্ম কলকাতায়ই। নিজের রাজ্যে, নিজের রাজ্যের রাজধানীতে, নিজের বাড়ির পথে এই অপমান সহ্য করেও আমাদের বেঁচে থাকতে বাধ্য যাঁরাই করুন না কেন তাঁদের এটা জানা ভালো যে এইভাবে চলতে থাকলে তাঁদের অশুভ হবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার বাঙালীকেই মানুষ বলে মানেন না। আবার কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনের সময়ে সি. আর. দাশ, নেতাজী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিধান রায়ের ফোটো না টাঙিয়ে রাজীব গান্ধীর প্রকাণ্ড ছবি টাঙিয়ে রেখেছিলেন কংগ্রেসী নেতারা। কেউ মন্ত্রী হবার জন্যে, কেউ অন্য কিছু হবার জন্যে।

কিন্তু বাংলার বুকে বাঙালীর এই দুর্দশা করতে থাকলে বাঙালীরা আলাদা দলও তো গড়তেও পারেন কোনোদিন? সব নেতাদেরই আত্মসম্মানজ্ঞান থাকলে, নিজের দেশের যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এমন করে অপমানিত, বুভুক্ষু, তাড়িত হতে হতে হতে হতে বিদ্রোহীতে রূপান্তরিত করতে বাধ্য করবেন না। সব নির্বাচনের আগে আপনারা প্রার্থীদের এও বলুন যে বাঙালী যাতে নিজ রাজ্যের রাজধানীতে অন্ততঃ মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারেন তার দায়িত্বও তাঁদের নিতে হবে।

আমাদের পাড়াতে চারটি প্রাসাদোপম বাড়ি আছে। বিরাট লনওয়ালা। এককালে বাঙালীদেরই ছিলো। বেচারাম বাঙালীদের। এখন অবাঙালীরা কিনে নিয়ে বিয়ের জন্যে ভাড়া দেন। যেদিন যেদিন বিয়ে থাকে সেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথের মোড়ে আসতে

আধঘণ্টা লেগে যায়। গাড়িতেও। সে কেউ অসুস্থই থাকুক আর যত তাড়াই থাকুক। ওঁদের কতকগুলো বিশেষ চালিয়াতি আছে। গেটের সামনে গাড়ি থেকে না নামলে, ওঁদের ইজ্জৎ থাকে না। এবং নিজেদের গাড়ির ড্রাইভার, তাঁরা গেটে ফিরে এসে দাঁড়ালে, এক মিনিটের মধ্যে গাড়ি না নিয়ে এলেও ওঁদের ইজ্জৎ চলে যায়। ফলে, পথের দু পাশেই গাড়ির দীর্ঘ লাইন পড়ে। আর মধ্যে দিয়ে আরও দু লাইনে কন্টেসা, রোভার আর মার্সিডিজের ভীড়ে এমন প্রকট জ্যাম হয় যে বলার নয়। তারপর রাত বারোটা অবধি বেসুরো গান এবং গাধা এবং শকুনের মিশ্র স্বরের অভাবনীয় চীৎকারের মন্ত্রোচারণ তো আছেই। গত সপ্তাহেই রাগ তুঙ্গে উঠেছিলো। আধঘণ্টা ধরে গলদ ঘর্ম হয়ে যে বাড়িতে বিয়ে, তার সামনে যখন পৌঁছলাম তখন কনস্টেবলকে বললাম, দু লাইনে গাড়ি পার্ক করতে দেওয়া হয়েছে কেন পথের দুপাশে? কনস্টেবল বললেন, গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যান। দূরে লাগিয়ে এসে তারপর কথা বলুন। বাঙালী কনস্টেবল। আমার খুবই তাড়া থাকলেও গাড়ি প্রায় চারশ গজ দূরে বড় রাস্তায় লাগিয়ে এসে বললাম, আপনার নাম্বার দিন। কনস্টেবল বললেন, নাম্বার দেবো? আপনি কে মশাই? আমি বললাম, আমি যেই হই না কেন, নাম্বারটা দিন। সেই বাড়ি থেকে তিনচার জন ধুতী আর টেরিলীনের পাঞ্জাবী-পরা লোক মারমূর্তীতে আমার দিকে এগিয়ে এলো। এ ব্যাপারটা বুঝি বলেই বুঝলাম যে, তাদের মধ্যে দু-তিন জন বডিগার্ড। ওদের পাঞ্জাবীর নিচে কোমরে রিভলবার গোঁজা আছে। বড়লোক অবাঙালীদের বিয়ে হলেই ওরকম আর্মড-গার্ড থাকেই। কোটি কোটি টাকার হীরে জহরৎ পরে মেয়েরা আসেন। এক একটি বিয়েতে দশ থেকে এক কোটি টাকা খরচ হয়। তার একপয়সাও বাঙালীরা পায় না। তাদের নিজেদেরই ডেকরেটর, ক্যাটারার সব থাকে। পোড়া-মাটির থালা বাসন, গেলাসের উপর কারুকার্য করা থাকে। এক একজনের বাসন, যা পরে ফেলে দেওয়া হবে; তার দামই পড়ে যায় পঁচিশ-তিরিশ টাকা। রাজীব গান্ধীর সরকার এইসব চোখে

না দেখে ইনকামট্যাক্সের রেইড করেন যতো ছুটো-ছাটা বাঙালী ব্যবসাদারদের।

বডিগার্ডরা চোখ রাঙাতেই আমি বললাম, চোখ রাঙাবেন না। পাঞ্জাবীর নীচে কি আছে তা আমি জানি। ওতে আমি ভয় পাই না।

একটা অন্যায় আমি করেছিলাম। রাগের মাথায় বলেছিলাম যে এঁরা বুঝি দশ টাকা দিয়েছেন; তার জন্যেই এই রকম অব্যবস্থা করতে হলো ?

অন্যায় নিশ্চয়ই হয়েছিলো। কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলরা আপনার আমার সকলের সামনেই পয়সা নেন। তবে সামান্য মাইনে পান বলে ওঁদের আমি দোষ দিইনা। কেন্দ্রের হর্তা-কর্তারা, এবং রাজ্যেরও কেউ কেউ বড় বড় ডীলে কোটি-কোটি টাকা গত চল্লিশ বছরে বানিয়েছেন শুনি। এই বছরেই বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এর উদ্যোগে প্রকাশ পেয়েছে যে সুইস্-ব্যাঙ্কেই পঞ্চাশ হাজার কোটি বা ওর কাছাকাছি টাকা ভারতীয়রা রেখেছেন। অনেকের কাছেই শুনি যে, তার মধ্যে বিভিন্ন সময়ের হর্তা-কর্তাদের টাকাও নাকি আছে। অনুযোগ যদি মিথ্যে হয় তবে সরকার তথ্য দিন আমাদের। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে আগে প্রত্যেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পত্তির হিসেব, বার্ষিক আয়ের হিসেব, এবং ইনকামট্যাক্স ওয়েলথট্যাক্সের অ্যাসেসমেন্টের রেকর্ডস্ আমাদের কাছে প্রকাশ করুন। সুইস্ ব্যাঙ্করা আমানতকারীদের নাম কখনওই বলেন না। নাম কখনও জানা যাবে না। কিন্তু এতো টাকা এবং কি করে তা বিদেশে জমলো তা জানতে চাইলে আপনারা অন্যায় করবেন না।

যাই হোক, এই পরিপ্রেক্ষিতে কনস্টেবল এর দশ টাকা ঘুষ নেওয়াটা আমি অপরাধ বলে গণ্য করিনি। হয়তো একশ টাকাই নিয়েছিলেন। তাই দশ টাকা বলাতে অত চটে গেলেন। কিন্তু নাম্বার দিলেন না। বললেন, নাম্বার দেবো না। সার্জেন্ট এসে

অর্ডার দিয়ে গেছেন। দেখি, সত্যিই একজন সার্জেন্ট কোমরে রিভলবার গুঁজে পথের মোড়ে ডিউটি করছেন। সার্জেন্টকে কিছু না বলে আমি পরদিন পুলিশ কমিশনার বিকাশকলি বসুকে একটি চিঠি লিখে সব জানাই এবং অনুরোধ করি যে, ঐ রাস্তার একদিকে যেন 'নো-পার্কিং' করে দেওয়া হয় প্রায়ই ট্রাফিক জ্যামের নিরসনে।

আপনারা বলেন পুলিশ কাজ করে না। পরদিন অফিস-ফেরতা দেখি বাঁদিকের গাছের উপরে "নো পার্কিং অন দিস্ সাইড অফ দ্যা স্ট্রীট" লেগে গেছে। আমার মতো নগণ্য, হয়তো লেখালিখির মাধ্যমে নামটি পরিচিত বলেই, একটি চিঠির উপরে যদি পুলিশের সবচেয়ে বড় সাহেব, 'নগর-কোটাল' এমন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেন তাহলে কলকাতার পুলিশ কাজ করেন না এ কথা আমি মানতে রাজী নই। আপনারা পুলিশ কমিশনারকে লিখে দেখুন। ন্যায্য কারণে লিখবেন। নিজের ব্যক্তিগত ও অন্যায় স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নয়। দেখবেন কাজ হয় কী না।

আপনারা হয়তো ভাবছেন আমি মানুষটি বড় রাগী, বড় ঝগড়াটে টাইপের। কিন্তু কি করি! যে ঝগড়া, যে রাগ আপনাদের প্রত্যেকেরই যথাস্থানে যথাসময়ে প্রকাশ করবার, তা যদি আপনারা না করেন তাহলে এই প্রৌঢ় বয়সে আমাকেই তা করতে হয়। মেরুদণ্ড যে এখনও টান-টানই আছে! যে-ঝগড়া, যে-রাগ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়, নিজের দেশের, নিজের রাজ্যর অগণ্য বোবা সর্বংসহ মানুষের তরফে, সে ঝগড়া বা রাগে নিজের চরিত্র কলঙ্কিত হয় না।

আপনারা প্রত্যেকে সজাগ থেকে, নিজেদের পাঁচ-দশ মিনিট সময় নষ্ট করে ঝগড়া বা রাগ করলে, আমার মতো প্রৌঢ়দের বদ্‌নাম বৃদ্ধির হাত থেকে তো মুক্তিই হয়! 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে'। অন্য প্রজন্মের মানুষ আমরা। আমরা এই সব "গোলমেলে" জিনিসে বিশ্বাস করে এসেছি, বড় হয়েছি "হও ধরমেতে বীর হও করমেতে বীর হও উন্নতশির নাহি ভয়/নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান/বিবিধের মাঝে

দেখো মিলন মহান/আসিবে ভারতে পুন জাতীয় উত্থান/জগজন মানিবে নিশ্চয়"-এই গান শুনেছি মা-বাবার গলায়। তাই আমার স্বভাব হয়ে গেছে ডন কুইক্‌সো এর মতো। দেশের, রাজ্যের যা অবস্থা তাতে পথে পথে অনেকই "ডন কীয়টের" দরকার বোধহয় হয়েছে, যাঁরা অন্যায় দেখা মাত্রই তার প্রতিকার প্রতিবাদ করতে চান।

শেষে হার হয়েছিলো ডন কীয়টের। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনাদের হবে না। কারণ আপনাদের এই জেহাদ অলীক নয়, ফ্যানটাসী নয়; অতি রূঢ় বাস্তবের কারণেই লড়াই।

"আ রাইটার ইজ অ্যান আউটলায়ার লাইক আ জীপ্‌সী...ইফ হী ইজ আ গুড রাইটার হী উইল নেভার লাইক আ গভর্নমেণ্ট হী লিভস্‌ আণ্ডার। হিজ হ্যাণ্ড শুড বী এগেনইস্ট ইট......। হী ক্যান বী ক্লাস-কনসাস্‌ ওনলী ইফ হী'জ ট্যালেণ্ট ইজ লিমিটেড। ইফ হী হ্যাজ এনাফ্‌ ট্যালেণ্ট, ওল্‌ ক্লাসেস্‌ আর হিজ প্রভিন্স। হী টেকস্‌ ফ্রম দেম ওল্‌ অ্যাণ্ড হোয়াট হী গিভস্‌ ইজ এভরীবডি'জ প্রপার্টি...
...নো ম্যাটার হোয়াট ইটস্‌ পলিটিকস্‌"—

—আর্নেস্ট হেমিংওয়ে।

আমি জানি, আমার এই বই অনেকের কাছেই একজন অশিক্ষিত অনুদার মানুষের নির্বুদ্ধি অথবা দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপ বলে মনে হবে। যাঁরা রাজনীতিতে পণ্ডিত, পণ্ডিত অর্থনীতিতে, সমাজনীতিতে; তাঁরা বলবেন, এহেন "গাঁওয়ার" লোকের মতামতের কোনো দামই নেই।

কিন্তু চল্লিশ বছর ধরে তো মহাবিদ্বান সব পুঁথি-পড়া রাজনৈতিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদদের, সমাজতাত্ত্বিকদের হরকৎ আমরা সাধারণ, অশিক্ষিত, নির্গুণ, বৈশিষ্ট হীন মানুষরা দেখলাম। দেখলাম, পৃথিবীখ্যাত বিভিন্ন ক্ষেত্রের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সাহস ও সমাজ-সচেতনতা। কিন্তু দেশের কি হলো? চল্লিশ বছরে কতটুকু ভালো হলো সাধারণ মানুষের অবস্থা?

কি করব? তাই আমার মতো মূর্খকেই কলম ধরতে হলো। বিদ্বানরা যখন মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন তখন উপায়ই বা কি?

আমার পরম সৌভাগ্য যে দেশের, শুধু বাংলারই নয়; সমস্ত দেশেরই সাধারণ-অসাধারণ গরীব-বড়লোক অগণ্য মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ আমার হয়েছে। তাই তাদের ব্যথার কথা, চোখের জলের কথা, ক্ষোভের কথা, হতাশার কথা কাছ থেকে জানি বলেই কথাকটি বলতে বসেছি। এই বক্তব্য যে আমার অন্তরের গভীরতম বিশ্বাস থেকেই উঠে এসেছে শুধু এইটুকুই বলতে পারি।

গণতান্ত্রিক সরকার হবে, "ফর দ্যা পিপল, বাই দ্যা পিপল, অফ দ্যা পিপল।" অথচ চল্লিশ বছরে জনগণের কোনো প্রকৃত ভূমিকাই এখনও দেখা গেলো না। এ পর্যন্ত ভারতে যত প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাঁর মধ্যে একমাত্র লালবাহাদুর শাস্ত্রীই প্রকৃত ভারতীয়। দেশের মাটি থেকে তিনি উঠে এসেছিলেন। তাঁর চেহারার চমক ছিলো না। ছিলো না 'অক্সোনিয়ান্' ইংরিজির দাপট। ইংল্যাণ্ডের 'হ্যারো' ইটন্'-এ পড়াশুনো করার সুযোগ তিনি পাননি তবু তাঁর মধ্যে ভারত-মনস্কতা ছিলো। পিঠে বই বেঁধে গঙ্গা সাঁতরে সেই সাধারণ ঘরের গরীব ছেলে পড়াশুনা করেছিলেন সাধারণ স্কুলে। দেশের মানুষকে না জানলে, তাদের প্রকৃত দুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে অবহিত না থাকলে দিল্লীর সাউথ ব্লকে বসে দেশকে সত্যিকারের অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ইন্দিরা গান্ধী কিভাবে কংগ্রেস দলের সভাপতি হয়েছিলেন, তারপর প্রধানমন্ত্রীও তা আপনারা জানেন। নেহরুর মৃত্যুর পর একদিন ট্রামে করে রাসবিহারী অ্যাভেন্যুতে যাওয়ার সময় দুটি বাঙালী ছেলে বলাবলি করছিলো, "আমাদের জন্যে রেখে গেলেন অ্যাশ (Ash), আর নাতিদের জন্যে ক্যাশ।"

ইন্দিরার মৃত্যুর আগে সঞ্জয়কে পরের নেতা করে তৈরী করা হচ্ছিলো। কেউই প্রতিবাদ করেননি পাছে তাঁর উপর ইন্দিরার কোপদৃষ্টি পড়ে।

সঞ্জয় ও রাজীব ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা করেছিলেন। গাড়ির শখ ছিলো সঞ্জয়ের ছেলেবেলা থেকেই। মারুতি গাড়ির কারখানার কথা আপনারা জানেন। আমার জানাশোনা একজন বাঙালী

ব্যবসায়ী সঞ্জয়ের আমলে মারুতি গাড়ির ডিলারশিপ নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা মার খেয়েছেন । কে তার প্রতিকার করবে? 'দ্যা কিং ক্যান ডু নো রং'। সঞ্জয়ের প্লেন-ক্রাশে মৃত্যু ঘটার পর তাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো তখন ইন্দিরা প্রথমে হাসপাতালে না গিয়ে গেছিলেন প্লেন-ক্র্যাশের সাইটে। চাবি খুঁজতে। কেন? সেই চাবিতে কোন্ আলমারী খুলতো তা আপনাদের মতো সাধারণ মানুষের জানা নেই। তবে ঘটনাটি অস্বাভাবিকই!

রাজীবকে সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর একইভাবে কংগ্রেসের সভাপতি করা হলো। তারপর ইন্দিরার মৃত্যুর পর আমরা টি-ভি তে দেখলাম কিভাবে প্রধানমন্ত্রী করা হলো তাঁকে। ইন্দিরার মৃত্যুর খবর এই গণতান্ত্রিক দেশে রাজীব গান্ধী দিল্লীতে ফিরে না-যাওয়া পর্যন্ত চেপে রাখা হলো। রেডিও ও টি ভি. যে আচরণ করলো তা রাশিয়ার মতো দেশ হলেও না-হয় মানিয়ে যেতো, বৃহত্তম গণতন্ত্রে এ ঘটনা অবিশ্বাস্যই। প্রণববাবুর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কোনোরকম যোগ্যতা ছিলো কিনা জানি না কিন্তু সেই সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় বহু অভিজ্ঞ ও বয়স্ক মন্ত্রী ছিলেন। যা আমাকে অবাক করেছিলো এবং ভাবিতও তা হচ্ছে এইই যে, বাবু জগজীবন রাম থেকে কমলাপতি ত্রিপাঠী, গণিখান চৌধুরী থেকে বুটা সিং এবং আরো অনেকেই কেন প্রতিবাদ করলেন না? একী গণতন্ত্র, না জমিদারী? দেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় মেরুদণ্ড-সম্পন্ন, সৎ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের কি এতই অভাব ছিলো যে চল্লিশ বছরে একই পরিবারের বাবা এবং মেয়ের পর রাজনীতিতে আসতে অনিচ্ছুক এই সুদর্শন যুবক ব্যতীত আর কেউই প্রধানমন্ত্রী হতে পারলেন না? মোরারজী ও চরণ সিংএরও কি কোনো গোপন দুর্বলতা ছিলো? তা নইলে কেন বার বার কেন্দ্রীয় নেতারা এই বন্দোবস্ত বরদাস্ত করে যাচ্ছেন তা হয়তো আপনাদেরও সাধারণ বুদ্ধির বাইরে। সকলেই কিঃ ব্ল্যাক-মেইলিং-এর ভয় পান? ব্ল্যাক-মেইলড্ হবার মতো কাজ দেশ-নেতারা, জনগণের সেবকরাও কি করেন?

এই দেশের রাজধানী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বাসস্থান, রক্ষণাবেক্ষণ,

আমোদ-প্রমোদের জন্যে যত কোটি টাকা বছরে খরচ হয় তার কোনো হিসেব কি আমরা পেয়েছি? আজ অবধি কোনো অর্থমন্ত্রীই কি সমস্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রত্যেক মন্ত্রীর ব্যক্তিগত ও পরিবারগত আয় ও সম্পত্তির হিসেব আমাদের অথবা সংবাদপত্রর কাছে তো দূরস্থান, পার্লামেন্টেও পেশ করতে বলেছেন?

'ল অফ কনট্রাকট'-এ বলে যে যদি কেউ সুবিচার চান তবে তাকে "পরিচ্ছন্ন হাতেই" তা চাইতে হবে। নেতাদের ভোট-যোগানো জনগণ এদেশে করদ-রাজ্যর প্রজাদের মতোই পীড়িত।

প্রতি বছর দেশে যে ডামাডোলের সঙ্গে ইনকাম ট্যাক্স, কাস্টমস্, ফরেন-এক্সচেঞ্জের রেইডস্ হয় ব্যবসায়ীদের অফিসে বাড়িতে এবং যা ফলাও করে প্রচার করা হয় কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত টি-ভি, রেডিও এবং বিভিন্ন বেসরকারী মাধ্যমে তাতো আমরা জানিই। কিন্তু তুলনা-মূলকভাবে এ পর্যন্ত কজন বদ্‌নামী আমলার বাড়িতে রেইড করা হয়েছে? কজন মন্ত্রীর বাড়িতে? "প্যারালাল ইকনমির" জনক যে রাজনৈতিক নেতা এবং অন্যরা তাঁদের উপর এই সব অস্ত্র সমান ভাবে প্রয়োগ করা হয়নি কেন? তাঁরাতো আমাদেরই নির্বাচিত সেবক। দেশের সেবা করবার জন্যেই তো তাঁদের চাকরী।

জানি না, এ প্রশ্ন সরাসরি একজনও পণ্ডিত বা বুদ্ধিজীবী এতদিনেও করলেন না কেন? ব্যবসায়ীরা, চাকুরীজীবীরা, পেশাদারেরা তো তবু ট্যাক্স দেন। তাঁদের টাকাতেই তো সরকার চলে, দেশের ক্রিয়াকাণ্ড সংঘটিত হয়। কিন্তু এম. পি. ও এম. এল. এদের যা মাস-মাইনে তাতে তাঁদের তো অনেকেরই দেশের অগণ্য সম্ভ্রান্ত ভদ্র শিক্ষিত কৃতি মানুষেরই মতো না-খেয়েই থাকার কথা! কিন্তু তাঁদের অনেকেরই এতো সম্পত্তি, এতো কারবারের লগ্নী, এতো প্রমত্ত ফুটানি আসে কোথা থেকে? এইসব মূল প্রশ্ন যে দেশের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষদের মনে কখনও জাগতে পারে একথা কি তাঁরা একবারও ভাবেন না?

এই দেশের মালিক তাঁরা যতটুকু আমি ও আপনিও তো ঠিক

ততটুকুই। তবে কিসের ভয় আমাদের? কিসের দ্বিধা? সোজা কথা সোজা করে মুখের উপর জিগ্‌গেস করবার? সব নির্বাচনের আগেই কেন্দ্রীয় ও সমস্ত রাজ্য সরকারের প্রত্যেক মন্ত্রীর পারিবারিক, নিজনামের ও বেনামের ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় সম্পত্তি ও লগ্নীর হিসাব সরকারী মাধ্যমের দ্বারা নয়, বেসরকারী মাধ্যমের যোগ্য মানুষদের দিয়ে খতিয়ে নিয়ে প্রকাশ করতে আপনারা প্রত্যেকে দাবী জানান।

এই সব তথ্য না দিলে আপনারা কি সিদ্ধান্ত নেবেন?

এ ব্যাপারে পেশাদার মানুষদের নিয়ে একটি প্যানেল করা যেতে পারে।

প্যানেল, যাদের সততা, সাহস এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই কারো, তেমন আইনজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, চাটার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট, সিভিল এঞ্জিনীয়র, মেকানিকাল এঞ্জিনীয়র নিয়ে গঠিত হোক। মোটকথা এমন সব মানুষ, যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে সৎ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের করুণার কোনোরকম প্রত্যাশী নন।

আগে নিজেদের সততার পরীক্ষা, সরকার যাঁরা চালান তাঁরা দিন; তারপরই দেশের মানুষের বিচারে বসবেন। গত চল্লিশ বছরে এই দেশ-চালনার ব্যবসা থেকে তাঁরা কত ব্যক্তিগত মুনাফা ওঠালেন তাঁর হিসেব ধরা পড়ুক তারপর আপনাদের ট্যাক্স-ফাঁকির জ্বালাময়ী বক্তৃতা কান খুলে শুনবেন। বড় চোরেরা ছোট চোরদের বিচার করে আসবে চিরটাকাল এমন শিবঠাকুরের আইন আর কতদিন চলবে?

ভারতে আয়কর আইন এসেছে ১৯৩৩ সালে। সম্পদকর আইন এসেছে ১৯৫৭ সালে। তার আগে সকলের পক্ষেই বড়লোকি করা সহজ ছিলো। কোনো ট্যাক্সেরই কোনো বালাই ছিলো না। কিন্তু কালিদাসের কাল তো কবে কেটে গেছে।

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং বোধহয় আজ অবধি একমাত্র কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যাঁর সততা ও ন্যায়বোধ নিয়ে কেউই প্রশ্ন তুলবেন না। আমার মনে হয়

রাজীব গান্ধীও সৎ। এবং ওঁর আন্তরিকতাটাও বোধহয় লোক দেখানো নয়। আমরা পথের মানুষ। দূরের মানুষ, সাধারণ ভোটদাতা; আদার ব্যাপারী। জাহাজের খবর ঠিকঠাক পাইই বা কি করে?

তাঁর হাবভাব, তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর প্রায় অবিশ্বাস্যরকম স্থৈর্য-ধৈর্যতে তিনি আমার এবং অনেকের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাও আদায় করে নিয়েছেন। কিন্তু রাজীব বা বিশ্বনাথপ্রতাপরা ভালো হলেই তো হবে না। অন্যদের প্রত্যেককেই ভালো হতে হবে। নির্বাচনের আগে, কংগ্রেসের টিকিট পাওয়ার আগে দিল্লীর কংগ্রেস অফিসে যে ধরণের আড়ম্বর ও যে ধরণের মানুষদের ও অগণ্য গাড়ির নমুনা দেখেছি গতবারে তাতে বিপন্ন বিস্ময় ছাড়া আর কিছু জাগেনি মনে। বামপন্থী নেতারা ও প্রার্থীরা, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে; কখনওই এরকম প্রতিক্রিয়া জানাননি যে মনে এ কথা অবশ্যই বলব। তবে ইদানীং কারো কারো সম্বন্ধে অন্যরকম কথাও শুনেছি।

প্রায় সর্বস্তরেই প্রশাসনের একাংশ যে-পরিমাণ অসৎ, উদাসীন এবং অত্যাচারী হয়ে উঠেছে, মোসাহেবী এবং অসততাই যাদের প্রধান গুণপনা এদেশে আপনার ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখেই বা কি করবে? এখনকার শিক্ষা আর প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের মূল ও একমাত্র লক্ষ্য তো ভালো-থাকা, ভালো-খাওয়া, প্রতিবেশির মনে ঈর্ষা জাগানো। উচ্চ-শিক্ষিত মানুষের জীবনের গন্তব্য তো এই কানাগলিতে এসেই আটকে গেছে। টিভির বিজ্ঞাপনগুলি কি আপনারা লক্ষ্য করেন? দেখে মনে হয়, আমরা বুঝি বিলেত—আমেরিকাতেই আছি।

বনে একটি শম্বর বা বাইসন মেরে দেখেছি, পনেরো কুড়ি মাইল থেকে গভীর জঙ্গলের সুঁড়িপথ বেয়ে নারী পুরুষ শিশু আসছে দূর দূরান্ত থেকে শালপাতার দোনায় মুড়ে একটু মাংস নিয়ে যাবে বলে। বছরে দুবছরে তারা একবার মাংস খেতে পায়। তাও শিকারেরই মাংস। শিকারিদেরই দয়ায়। আম্বিং এর গুঁড়ো ভাতের সঙ্গে মেখে করে খেয়ে তারা সারা দিনের শারীরিক পরিশ্রমের জন্যে

তৈরী হয়। এবং তিরিশ-বত্রিশ বছরে পিলে বড় হয়ে কি যক্ষা হয়ে মারা যায়।

ছুটি মোটা ভাত, মোটা কাপড়, সামান্য আশ্রয়, রোগে সামান্যতম চিকিৎসা, একটু পানীয় জল যে সব ন্যূনতম প্রয়োজন তার কিছুমাত্রও তো পূরণ হলো না এতদিনেও। রঙীন টিভিতে বিভিন্ন মন্ত্রীদের সুন্দর মুখ আর সুন্দর হিন্দী ইংরিজিতো অনেকই শুনলাম আমরা। রেডিও এবং টি.-ভি. যা হতে পারতো সত্যিকারের গণমাধ্যম তাতো কেন্দ্রের লজ্জাহীন লাগাতার প্রচার যন্ত্র হয়েই রইলো। এ কেমন গণতন্ত্র?

সেই জওহরলালের সময় থেকেই শুনে আসছি "ভাইয়ো ঔর বহেনোঁ। আপনাদের ধৈর্য ধরতে হবে। বড় কাজে ধৈর্য লাগে।"

ধৈর্য তো অনেকই ধরা হলো। ন্যূনতম কাজ কবে হবে? তাইই এখন আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য।

কংগ্রেস এবং বিশেষ করে একটি পরিবার ভারত শাসন করার অনেকই সময় পেয়েছেন। এর পরেও তাড়াতাড়ি ফল না দেখাতে পারলে আরও সময় তাঁদের যে দেওয়া যাবে না এই কথাটা আপনাদের বলার সময় এসেছে।

কেউ কেউ বলবেন যে, কী পাগলের মতো কথা! কংগ্রেসের বিকল্প কি? আর কোনো দল কি আছে? তাঁরা কি পেরেছেন একত্রিত হয়ে বিরোধীতা করতে কংগ্রেসের? সামান্য কটি রাজ্য ছাড়া কংগ্রেসের তো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সব জায়গাতেই। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই নেতা হয়েছেন। কথাটা ভুলও নয়। কিন্তু সেই কারণেই এই গণতন্ত্রর স্বরূপ নিয়ে নতুন করে ভাবারও সময় এসেছে।

কিন্তু ভোটদাতা হিসেবে আপনারা এবারে দলের চিহ্ন না দেখে প্রার্থীকেই দেখুন। সে প্রার্থী যে দলেরই হোন না কেন।

সেই প্রার্থী নির্দল প্রার্থীও হতে পারেন। নির্দলরা মিলে যা সিদ্ধান্ত নেবেন সেই মতোই দেশ চলবে। প্রার্থীর যদি সততা থাকে, তার যদি মেরুদণ্ড অর্বুদ-কবলিত না হয়, তাঁর যদি সহজ-মোসাহেবি করেই

নিজের এবং নিজের পরিবারের স্বাচ্ছল্য অর্জনের লোভ না থাকে, ব্যক্তিগত জীবনে ত্যাগ অথবা দান থাকে, তিনি যদি আপনাদের হয়ে ভালো বলতে—কইতে পারেন, রাজ্যর সংসদে এবং দিল্লীর পার্লামেণ্টে মুখচোরা না হন ; তবেই তাকে ভোট দিন।

দরকার হলে প্রত্যেক কেন্দ্রর পার্টি-নিরপেক্ষ ভোটদাতারা নিজেরাই আপনাদের নিজের কেন্দ্রে পাঁচজন যোগ্যতম প্রার্থীর নামের তালিকা করে প্রত্যেক ভোটদাতার বাড়ি গিয়ে তাঁর মনোনয়ন নিয়ে আসুন পরের বারে। আপনাদের নিজের মনোনয়নে যিনি মনোনীত হবেন তাঁকে আপনারাই নিজেরা দাঁড় করান। পার্টির মনোনীত প্রার্থীর কথা ভুলে যান।

আজ অবধি যা দেখলেন আপনারা তা হচ্ছে নির্বাচন মানেই টাকারই খেলা! কোনো কোনো পাটির প্রার্থী মনোনয়ন চাইলে তাঁকে মোটা অংকের কালো টাকা দিতে হয় বলে শুনেছি। নইলে, পার্টি নিজেই অভাবনীয় অংকের মোটা টাকা ব্যয় করেন। এই টাকা, মনে রাখবেন, আমার আপনারই টাকা। এই টাকা আসে বড় বড় ব্যবসাদারদের উৎকোচ থেকে। এবং সেই ব্যয়-ভার তারা চাপিয়ে দেন সরকারের সম্মতিক্রমেই আপনার মতো সাধারণ মানুষদেরই ঘাড়ে। আজকের যে মুদ্রাস্ফীতি তাতে যার যাইই রোজগার থাক না কেন, প্রত্যেকেরই যে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তার জন্যে পরোক্ষে এই মহান জনদরদী সরকারেরাই দায়ী। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবারে রুখে দাঁড়ান। নীরবে ঘরে ঘরে এই বিপ্লব আনুন। বিভিন্ন পার্টির 'চলবে না' আর 'করতে হবে'র পেশাদারী মিছিলের উপর আপনাদেরও নিশ্চয়ই ঘেন্না ধরে গেছে এতবছরে।

নিজেদের কেন্দ্রে নিজেদের প্রার্থী মনোনয়ন করে দাঁড় করাতে টাকা লাগবে না। প্রয়োজনে, পাড়ার ছেলেমেয়েদের ডাকুন। বাঙালী ছেলেমেয়েকে চাকরী-দেয় কে? সবাইই তো বেকার। তাদের বলুন, জুলুম না করে প্রত্যের ভোটদাতার কাছ থেকে এক টাকা থেকে পাঁচ টাকা করে নিতে। দান হিসেবে। এবং তার হিসেব রাখতে। যদি

কেউ নিজে থেকে বেশি দেন তো ভালো কথা। যদি কারো এক টাকা দেবার অবস্থাও না থাকে (অনেকেরই হয়তো থাকবে না। চল্লিশ বছরে এই তো আমাদের প্রগতির নমুনা!) তবে তাঁদের কাছ থেকে নেবেনই না। যে টাকা চাঁদা উঠবে তা থেকে নির্বাচনের জামানত এবং যে ছেলে মেয়েরা খাটবে তাদেরও সম্মানীর সংস্থান হয়ে যাবে। হাজার হাজার নতুন জীপগাড়ি করে বিভিন্ন পার্টির নিশান উড়িয়ে ভাড়া করা গুণ্ডাদের ভুল বাংলা এবং ইংরিজিতে মাইকের চিৎকার শুনতে হবে না আপনাদের। এই নির্বাচনী প্রচার নীরবে হয়ে যাবে চোখের আড়ালে। ঘরে ঘরে। পার্টির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, নীতি-দুর্নীতি, ক্যাপিটালিজম-কম্যুনিজম্ এর কথা না ভেবে যে কেন্দ্র থেকে তিনি দাঁড়াচ্ছেন এবং আপনারা যাঁকে নির্বাচিত করছেন সেই কেন্দ্রের যাবতীয় সমস্যার মোকাবিলা এবং সমাধান করাই হবে তাঁর কাজ। পথ সারাই, পথ-ধোওয়া, আবর্জনা-পরিষ্কার, স্কুল, হাসপাতাল, আইন-শৃঙ্খলা এই সবকিছু সম্বন্ধে প্রত্যেক সপ্তাহে সেই কেন্দ্রর ছেলেমেয়েরা তাঁকে অবহিত করবেন। তাঁকে জান পণ করে লড়তে হবে। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকেই মদত দিন কী লঘিষ্ঠ দলকেই। কোনো সরকারই তাঁদের পৈতৃক জমিদারীর টাকা ভোটদাতাদের জন্যে খরচ করেন না। সেই টাকা আপনাদেরই টাকা। আপনাদের জন্য তা খরচ না করে তাঁরা যাবেন কোথায়?

এখনও ভেবে দেখুন। পার্টি-সীস্টেম সভ্য, শিক্ষিত, তুলনামূলকভাবে উচ্চতর জীবনধারণের মানের দেশে হয়তো চলে। কিন্তু যে দেশের মানুষ একবেলা ভরপেট খেতে পেলে বা একটি ধুতি বা শাড়ি পেলে বা কোলকাতায় ট্রাকে করে এসে একদিন শহরের চিড়িয়াখানা বা যাদুঘর দেখে গেলেই পাঁচ বছরের মেয়াদী ভোটখানা অবলীলায় দিয়ে দেয় সেই দেশের পার্টি বা ভোটের দামটা কি? জোর জবরদস্তি করে আদায় করা ট্রাকে বা বাসে, বিনা টিকিটের রেলে, লক্ষ লক্ষ সরল গ্রামবাসীদের শহরে দেখাতে এনে শহরের যে মুষ্টিমেয় মানুষ শিক্ষা বা বুদ্ধি বা ভাবনা নিয়ে ওয়াকিবহাল, তাঁদের সব পার্টিরাই দেখান 'শো অফ স্ট্রেন্থ'।

এই নাকি জোর! হাসিরই ব্যাপার। প্রতি শহরের, গ্রামের, অঞ্চলের প্রতি কেন্দ্রের ছেলেমেয়েদের মনে ভয় থাকতে পারে যে, পার্টির ভাড়া-করা গুণ্ডারা তাদের মেরে দেবে। এই ভয় যদি থাকে তাহলে তরুণ-তরুণীরা এগোবেন না। ভয়েরই আরেক নাম অজ্ঞানতা। যার বুকে ভয় আছে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপনারা নিজেদের জিগ্গেস করুন, আমার এই সুন্দর দেশের নিপীড়িত, সর্বস্বহৃত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আনন্দ, সুস্থ জীবনের সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো, না খারাপ? তাছাড়া, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যদি বলতে পারেন, যে নতুন রাজনীতিতে আপনারা নামছেন, তা কেরোসিনের পারমিট বা মিনিবাসের পারমিট বা ইন্টারন্যাশনাল ডীলের "কাট্" বা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের উৎকোচ-প্রত্যাশী নয়। এই রাজনীতি দেশের প্রত্যেকটি মানুষের ভালো করবার রাজনীতি, এই রাজনীতিতেই দেশের প্রত্যেক মানুষের সমান ভালো হবে। এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে প্রত্যেক মানুষ দুবেলা খেতে পায়, মোটা কাপড় জামা পরতে পায়।

যে সব ছেলেরা গুণ্ডামি করেন তাঁদের কথাও ভাবুন? তাঁরা কি শখ করে গুণ্ডা হয়েছে? তাঁদের চাকরী বা ব্যবসা থাকলে, মাথা উঁচু করে মানুষের মতো বাঁচতে পারলে তাঁরা রাজনৈতিক দলেদের "মৌসুমী" ভালোবাসার শিকার হতেন না। গুণ্ডারা কেউই জন্মে থেকেই গুণ্ডা নন। তাঁদের ঐ পথে এই সমাজই নিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে গায়ের জোরের রাজনীতি। ভালোবাসার রাজনীতি নয়। তাঁদেরও আপনারা ডেকে নিন। এই দেশ ওঁদেরও যতটা আমাদেরও ততটাই। ভদ্র জীবিকা না থাকলে ওঁরাই বা কি করবেন?

বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "আমাকে পাঁচটি ছেলে দাও। মাত্র পাঁচটি ছেলে, যারা খাঁটি। এই দেশের মুখ আমি বদলে দেব। উনি আরও বলেছিলেন যে, সংসারে যা-কিছুই ঘটে, ভালো বা মন্দ; তাতে দু পক্ষের ভূমিকা থাকে। যেটুকু তোমার হাতে আছে, তোমার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে; সেই পঞ্চাশভাগকে তুমি তোমার নিয়ন্ত্রণে

রাখো। বাকিটুকু নিয়ে তুমি ভেবো না।” এইবারে তো সময় নেই, অন্ততঃ পরের বারেও যদি করেন তবে দেখবেন কোনো গুণ্ডাই আপনাদের কিছু করবেন না। যাঁরা অন্যায় করে, তারা সব সময়ই ভীরু হয়। তাছাড়া নিজের দেশে, নিজের ঘরে, নিজেদেরই নির্বাচিত কিছু অসৎ, বিবেকরহিত, নীতিহীন মানুষের হাতে ধীরে ধীরে এমন করে মরার চেয়ে একেবারে মরে যাওয়া খারাপ কিসের? জন্মালে মরতে তো হয়ই। অমর তো কোনো মানুষই নয়। মানুষের অমরত্ব আসতে পারে শুধুমাত্র কীর্তির মধ্যে দিয়েই। অমরই যদি হতে চান তো কীর্তি দিয়েই অমর হোন। জরাগ্রস্থ, অপমানিত, অবহেলিত বার্দ্ধক্য অবধি অপেক্ষা করার দরকার কি আছেই?

মানুষের প্রগতির ইতিহাসে অনেকই সময় ধরে। ঠিকও ভুল, ভুল ও ঠিক করতে করতেই মানুষ এগিয়ে চলে তার পরম প্রার্থিত গন্তব্যর দিকে। আপনাদের ভাবনা যদি ভুলও হয় তাহলেও তা দোষের কি? ভুল তো ক্রাইম নয়। জার্মান দার্শনিক নীট্‌শে বলেছিলেন: “হোয়েন আ ট্রি গ্রোজ আপ টু হেভেন্ ইটস্ রুটস্ রীচ ডাউন টু হেল।” আপনাদের প্রত্যেক বন্ধু-বান্ধব, আপনাদের দাদা-বৌদি, ভাই-বোন, মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করে তারপরই মনস্থির করুন। আমার মতো একজন মূর্খ অশিক্ষিত মানুষের কথা আপনারা শুনবেনই বা কেন? অন্যর কথাতে কিছু করবেন কেন? কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরই তা করা উচিত নয়।

তাই অবাক হয়ে ভাবি কি করে অন্যের কথাতে নেচে তাঁদের তথাকথিত রাজনীতি নিয়ে মেতে থেকে, যে-রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য বড় সামান্য, যে রাজনীতির কোনো দূরদৃষ্টি নেই তাকে জড়িয়ে ধরে আপনারা আপনাদের স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখেন। কয়েকজন অবুঝ, দুর্বিনীত, ওয়ার্ড-বয় বা পরিচ্ছন্নতার জিম্মাদারদের হামলার ভয়ে হাসপাতাল বন্ধ রাখতে দেন? আপনারা কি শুধুই প্রশ্বাস নেন আর নিঃশ্বাস ফেলেন? আপনারা আসলে কি বেঁচে নেই?

"আই কনটেন্ট মাইসেল্‌ফ উইথ অ্যাডাপটিং দ্যা কমোন ওপিনিয়ন কনসার্নিং ইট, এণ্ড রিগার্ড দ্যা এস্টাব্লিশমেন্ট অফ দ্যা পোলিটিকাল বডি অ্যাজ আ রিয়্যাল্ কনট্রাক্ট বীটউইন দ্যা পিপল অ্যাণ্ড দ্যা চিফস্, চোজন বাই দেম ; আ কনট্রাক্ট বাই হুইচ বোথ পার্টিজ বাইণ্ড দেমসেল্‌ভস্ টু অবজার্ভ দ্যা ল'জ দেয়ারইন এক্সপ্রেসড, হুইচ ফর্ম দ্যা টাইজ অফ দেয়ার ইউনিয়ন। দ্যা পীপল্ হ্যাভিং ইন্ রেসপেক্ট অফ দেয়ার সোশ্যাল রিলেশানস কনসেনট্রেটেড ওল্ দেয়ার উইলস্ ইন ওয়ান, দ্যা সেভারাল আর্টিকল্‌স্, কনসার্নিং হুইচ দিস উইল ইজ এক্সপ্লেইনড, বিকাম সো মেনি ফাণ্ডামেন্টাল ল'জ. অবালগেটরী অন ওল্ দ্যা মেম্বারস অফ দ্যা স্টেট উইদাউট একসেপশান, এণ্ড ওয়ান অফ দীজ আর্টিকেলস্ রেগুলেট্‌স্ দ্যা চয়েস অ্যাণ্ড পাওয়ার অফ ম্যাজিস্ট্রেটস্ অ্যাপয়েণ্টেড টু ওয়াচ ওভার দ্যা একজিকুশান অফ দ্যা রেস্ট। দিস পাওয়ার, এক্সটেণ্ডস টু এভরীথীং হুইচ মে মেইনটেইন দ্যা কনস্টিট্যুশান, উইদাউট গোয়িং সো ফার অ্যাজ টু অলটার ইট। ইট ইজ অ্যাকম্প্যানিড বাই অনার্স, ইন অর্ডার টু ব্রিং দ্যা ল'জ অ্যাণ্ড দেয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস ইনটু রেসপেক্ট। দ্যা মিনিস্টারস আর ওলসো ডিস্টিংগুইশড বাই পার্সোনাল প্রেরোগেটিভস, ইন অর্ডার টু রি-কমপেনস্ দেম ফর দ্যা কেয়ারস অ্যাণ্ড লেবার হুইচ গুড অ্যাডমিনিস্ট্রেশান ইনভলভস্।"

—জাঁ জ্যাকস্ রুসোর "সোশ্যাল কনট্রাক্ট থীওরী" থেকে

আমাদের দেশ যখন স্বাধীন হলো তখন এমনি করেই সংবিধান রচনা করে ফাণ্ডামেন্টাল ল'জ স্থির করে, যাঁরা দেশ চালনার ভার নিলেন তাঁদের উপর আমাদের আস্থা, সম্মান, শ্রদ্ধা ভক্তি সব উজাড় করে দিলাম। তাঁদের এবং পার্লামেন্টের সমস্ত মেম্বারদের নানারকম প্রেরোগেটিভ দিলাম। শিল্পী, চিত্রকর, গায়ক, বাদক, সাহিত্যিক, অভিনেতা, নাট্যকার, কবি সকলের চেয়ে তাঁদের বেশি সম্মান দিয়ে ভি-আই-পি, ভি-ভি-আই-পি করলাম, কারণ তাঁরা দেশসেবক। চল্লিশ বছর পর সেই সংবিধান, সেই শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মানের দেশ-নেতারা আমাদের জন্যে কি করলেন তা খতিয়ে দেখা যাক একটু।

চল্লিশ বছরে এই সংবিধান পঞ্চাশবার সংশোধিত হয়েছে। এবং একান্নতম সংশোধনী বিলও আনা হয়েছে। যে-কোনো, আইন তা সংবিধানই হোক আর যাইই হোক, শাসক দলের খেয়ালখুশি মতো, ভোট পাবার পথ সুগম রাখার কারণেই যদি পঞ্চাশবার সংশোধিত হয় তবে তাকে নতুন করে লেখাই বোধহয় শ্রেয়। তাছাড়া সংবিধানের কোনো নির্দেশ যদি প্রকৃতার্থে না মানা হয়ে থাকে, তার পথ প্রদর্শক নীতিগুলি যদি ধূলিসাৎ হয়ে গিয়ে থাকে তবে তা নতুন করে না-লেখার কোনো কারণ আছে বলে আমার অন্ততঃ মনে হয় না।

প্রকৃত গণতন্ত্রে, অনেক সংবিধান অলিখিতও থাকে। আসল কথা হচ্ছে আন্তরিকতা। ভান বা ভণ্ডামি দিয়ে দলের গদী মজবুত করা যায়। তাতে দেশের বা দশের কোনো উপকার হয় না। এই দেশে বর্তমানে যে ধরনের দলীয় প্রথা চালু আছে তাতে পার্লামেন্টের মেম্বার বা অ্যাসেমব্লীর মেম্বারদের আর গড্ডালিকার মধ্যে কোনো তফাৎ আছে বলে মনে হয় না। ভারতবিখ্যাত আইনজ্ঞ এবং সৎসাহসী, এন. এ. পাল্‌কিভালা যিনি সংবিধান বিশেষজ্ঞও, একটি বই লিখেছিলেন ভারতীয় সংবিধানকে কি ভাবে বিকৃত করা হয়েছে তার উপর। বইটির নাম "কনস্টিট্যুশান্‌ ডিফেস্‌ড এণ্ড ডিফাইণ্ড" পারলে, বইটি পড়বেন।

আমাদের সংবিধান প্রত্যেক ভারতীয়র মৌলিক অধিকার কি কি তা সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছিলো।

সমতার অধিকার

অনুচ্ছেদ নং ১৪ থেকে ১৮

অনুচ্ছেদ ১৪। "ভারতের রাস্ট্র কখনও কোনো ব্যক্তিকে আইনের চোখে অসমান দেখবেন না। ন্যায্য আইনের অধিকার থেকে একজনও যেন বঞ্চিত না হন। প্রত্যেক নাগরিককে আইনের সমান সুরক্ষা দেওয়া হবে।"

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বাধীনতার বহু বছর আগে, নিজে আইন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বলেই কমলাকান্তর দপ্তরে লিখে গেছিলেন, "আইন? সে তো তামাশা মাত্র। বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া তামাশা দেখিতে পারে।"

আপনাদের কি মনে হয় 'বন্দেমাতরম' রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রর উক্তি স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরও সমান ভাবে প্রযোজ্য নয়?

সুপ্রীম কোর্টের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি পি. এন. ভগবতীই একমাত্র লোক যিনি এ বাবদে যুগান্তকারী কাজ করে গেছেন। আপনারা হয়তো জানেন না যে, যদি মনে করেন যে আপনার উপর অন্যায় জুলুম হচ্ছে, আপনাকে বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখা হয়েছে, আপনার বা আপনার পরিবারের বিরুদ্ধে সংঘটিত কোনো গুরুতর অন্যায়ের প্রতিবিধান হয়নি তবে আপনি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নামে একটি পোস্টকার্ড লিখে তাঁকে জানাতে পারেন। কোনো উকীল ব্যারিস্টার সলিসিটরের শরণাপন্ন না হয়েই। স্বাধীন ভারতের আইন-ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা যাঁরা সচল রাখেন তাঁদের ইতিহাসে শুধুমাত্র এই কারণেই মাননীয় ভগবতী সাহেবের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত।

কিন্তু সাধারণ ভাবে আইন এখনও তামাশাই মাত্র। যার পয়সা আছে বা রাজনৈতিক মদত নেই তার ভাইকে খুন করলে, বোনকে ধর্ষণ করলেও কোনো প্রতিকার নেই। বেচারী পুলিশ কি করবে? যাদের আপনারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন সেই সব পার্টির দাদাদের

কাজ তো আপনাদের ভালো করা নয় দাদাগিরি করা। গুণ্ডা-পোষণ, চোরা-কাববার, উৎকোচ গ্রহণ, হরিজন এবং নিম্নবর্ণের উপর অকথ্য অত্যাচার এই দাদাদের অনেকেরই ক্রিয়া-কাণ্ড। পুলিশকে অবাধ অধিকার দিন, তাদের এমন মাইনে দিন যাতে তাঁরা ভদ্রভাবে অত কষ্টর এবং ধন্যবাদহীন কাজ করার বদলে মানুষের মতো বাঁচতে পারেন মাথা উঁচু করে, এই ভয়াবহ মুদ্রাস্ফালিকে দমন করার ব্যবস্থা করুন, তখন আপনারা দেখবেন পুলিশ কি করে প্রত্যেক মানুষেরই জন্যে! পুলিশের হাত-পা বেঁধে রেখেছেন গত চল্লিশ বছর এই দাদারাই। তাঁদের মুখে এক আর মনে এক। গালাগালি খাবার বেলায় শুধু পুলিশ আর প্রশাসন। বাহাদুরী নেবার বেলায় তাঁরা।

আপনারাই গণতন্ত্রর সমস্ত শক্তির মূল উৎস, ভোটদাতারা। আপনারাই পারেন এই দাদাদের শায়েস্তা করতে। দেশকে বাঁচাতে, আপনার ছেলে-মেয়ে ভাই-বোন বাবা-মাকে মানুষের মতো বাঁচতে দিতে। আপনারা নিজেরাই যদি ঘুমিয়ে থাকেন তবে কি আর হবে? 'সরকার' বা 'দেশ' এই থার্ডপার্সন সিংগুলার নাম্বার অস্তিত্বটি কিন্তু সত্যিই তাই নয়। এরকম ফারস্ট পার্সন সিংগুলার নাম্বার আর দ্বিতীয় নেই। আপনিই দেশ। হ্যাঁ। আপনি। আপনি যতই গরীব বা বড়লোক, যত সবল বা দুর্বলই হোন না কেন—এই দেশ আর আপনি সমার্থক। যে ভাবে এই দেশকে আপনি গড়বেন, দেশ সেই চেহারাই পাবে। অল্পকটি টাকায়, ভবিষ্যৎ এর ব্যক্তিগত উপকারের আশ্বাসের ক্ষুদ্রতায় নিজের বর্তমানের ক্ষুদ্র স্বার্থর চড়ুই পাখি মনোবৃত্তিতে নিজের নিজের পরিবারের নিজের ছেলেমেয়ের এবং পুরো জাতেরই অস্তিত্বকে কারো কাছেই বিকিয়ে দেবেন না।

অনুচ্ছেদ ১৫। "রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের মধ্যে কোনোরকম তফাৎ করবে না। জাত, ধর্ম, পাত, লিঙ্গ, স্থান, অথবা অন্য কোনো ভাবেও।"

অনুচ্ছেদ ১৫ (২)। "কোনো নাগরিকের উপরই জাত, ধর্ম, পাত, লিঙ্গ, দায়িত্ব, বাধা-নিষেধ অথবা শর্ত আরোপ করা চলবে না। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে

[ক] দোকানে ঢোকা, জনতার রেঁস্তোরা বা ভোজনালয়ে ঢোকা, হোটেলে অথবা আনন্দানুষ্ঠানে

[খ] রাষ্ট্রের অর্থে পুরোপুরী বা আংশিকভাবে বানানো কুঁয়ো, জলাশয়, স্নানের ঘাট, পথ এবং জনগণের আনন্দানুষ্ঠানের জায়গাতেও সকলের সমান প্রবেশাধিকার থাকবে।"

অনুচ্ছেদ ৫ (৩)। "এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির ব্যাপারে নারী ও শিশুদের জন্যে বিশেষ সুবিধার কিছু বন্দোবস্ত যদি রাষ্ট্র করতে চান তাহলে তাতে বাধা থাকবে না।"

এই পনেরো অনুচ্ছেদের ব্যাপারে গত চল্লিশ বছরে কতটুকু করা হয়েছে তা শহরের এবং গ্রামের মানুষ মাত্রই জানেন। আপনারাই বিচার করবেন আপনাদের গ্যারান্টি-দেওয়া মৌলিক অধিকারের কতটুকু কেতাবেই লেখা আছে আর কতটুকু কার্যকরী হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১৬ (ক)। "রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যালয়ে কর্ম-সংস্থানের ব্যাপারে সমস্ত ভারতীয়র সমান সুযোগ থাকবে।"

কিন্তু আপনারা শিক্ষিতরা যেমন জাত-পাতের বিভেদ অপছন্দ করেন তেমন এও পছন্দ করেন না যে আপনার ছেলে বা মেয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষাতে অত্যন্ত ভাল ফল করেও তপশীলী জাতি এবং উপজাতিদের জন্যে সংরক্ষিত কোটায় অনেকেই অত্যন্ত খারাপ ফল করা সত্ত্বেও চাকরী পেয়ে গেলো অথচ আপনার ছেলেমেয়ে চাকরী পেলো না। রাষ্ট্রীয় প্রত্যেক চাকরীর (কেন্দ্র ও রাজ্য) ব্যাপারে তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের জন্যে প্রবেশের সময়ে আসন সংরক্ষিত আছে। আমি একটি ঘটনা জানি যেখানে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বলে সত্তর নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও একটি ছেলে চাকরী পেলো না কিন্তু তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের একজন পরীক্ষার্থী অনেকই কম নাম্বার পেয়েও চাকরী পেলো। শুধু কর্মসংস্থানই নয়, উন্নতির ক্ষেত্রেও এই প্রথা পালিত হয়। প্রমোশনের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি অচিরে তুলে নেওয়া উচিত।

দেশের প্রত্যেক মানুষকে সমান সুযোগ নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত। তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের প্রতি আমার দরদ কোনো রাজনৈতিক

নেতাদের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়। এ কথা আবারও বলছি, 'পারিধী', 'কোজাগর', 'সোপর্দ', 'জঙ্গলের জার্নাল', 'বিন্যাস' ইত্যাদি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন। এইরকম সংরক্ষণ প্রথা সামগ্রিকভাবে দেশের ক্ষতিই করেছে। কিন্তু একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ভোট যাতে কোনোক্রমে হাত না পড়ে সেই জন্যেই এ নিয়ে কোনো কথা কেন্দ্র আদৌ শুনতে রাজী নন। এ কথাও বলব যে, আই. এফ. এস., আই. এ. এস., আই. পি. এস., আই. আর. এস. এবং ফরেস্ট সার্ভিসে তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে থেকে অনেক মেধাবী অফিসারও এসেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁদের অনেককে চিনিও। তাঁদের মধ্যে অনেককেই আমাদের ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের চেয়ে অনেকই বেশি বুদ্ধিমান, ভদ্র ও সৎ বলেও জানি। কিন্তু আবার উল্টোটাও দেখেছি। দেশের প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই প্রথা দেশের প্রশাসনের ক্ষতি করবে হয়তো, যদি তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের পরীক্ষার্থীদেরও "কোয়ালিফায়িং নাম্বার" পেতে বাধ্য না করা হয়। ন্যূনতম "মানে" না পৌঁছনো হলেও 'কোটা সীসটেম' আছে বলেই যে ভালো ছেলেদের বাদ দিয়ে খারাপ ছেলেদের নিতে হবে এ কেমন সমানাধিকার? তাছাড়া এতে তো দেশের সমূহ বিপদও ঘটতে পারে। তাছাড়া তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত এবং দায়িত্ববান অনেকে আজকাল এ কথাও বলছেন যে তাঁদের আর সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। এই সংরক্ষণ প্রথা চালু থাকুক। কিন্তু তা থাকুক অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে-থাকা সকলেরই জন্যে। এবং সংরক্ষণ প্রথা থাকলেও প্রত্যেককেই একটি ন্যূনতম মানে পৌঁছেই সেই সংরক্ষিত পদগুলি পেতে হবে। দেশের সমস্ত সার্ভিসেই এই নীতি অনুসৃত হচ্ছে। এবং অন্য সমস্ত রাষ্ট্রীয় চাকরীতেই। দেশ আসলে যাঁরা চালান তাঁদের সততা, দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও মেধা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চেয়ে যে অনেক বেশি হবে এই তো প্রত্যাশার। তাছাড়া এতে যে তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের সত্যিকারের উন্নতি হচ্ছে তাও নয়। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক

প্রীতি ও শ্রদ্ধা আছে। অনেক উপজাতিদের সঙ্গে আমি মিশেছি, থেকেছি, তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা, জীবনযাত্রার কথা লিখেছি। 'কোজাগর'-এ এই সমস্যার কথা প্রকট হয়েছে। একটি উপজাতি ছেলে, আই. পি. এস. হয়ে গ্রামে আর এলোই না। বাবা মা ভাই বোনকে অস্বীকার করলো। শহরের চোখ-ধাঁধানো জীবনে বামুন-কায়েতদের সঙ্গে মিশে গেলো। যে তার গ্রামের ভালো করতে, তার দেশের ভালো করতে পারতো গ্রামে ফিরে গিয়ে, গ্রামকে তার সঞ্চয় দিয়ে, নেতৃত্ব দিয়ে বর্দ্ধিষ্ণু করতে ; সেও শহুরে আমলাশাহীর সহজ সুখের জীবনে সহজে সামিল হয়ে গেলো। প্রাচুর্য, রঙীন টি. ভি. আর ভি. সি. আর-এর সংস্কৃতিতে মজে গেলো। অ্যাফিডেবিট করে নামও সে বদলে ফেললো। অতীত জীবনকে সে ভুলে গেলো। সংবিধানের উদ্দেশ্য তো তা ছিলো না! প্রথমে মহৎ উদ্দেশ্যেই এই অনুচ্ছেদ আনা হয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পার্টি দেখলো ভোট-দখলের এতো এক মস্ত হাতিয়ার! চল্লিশ বছর চাকরীর ক্ষেত্রে এই "কোটা সিস্টেম" রেখেও এখনও তা একচুলও নড়ানোর সাহস কোনো দলেরই নেই। নড়ালেই যে ভোটে হাত পড়বে। অমন বিপদ কি ডেকে আনতে আছে ? দেশ তো তাদের কাছে থার্ড পার্সন সিংগুলার নাম্বার। ভোট আর গদীই তো সব।

আমার এই সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্যর যাথার্থ্যের প্রমাণ আপনারা সহজে পেতে পারেন যদি কাউকে দিয়ে বেসরকারী উদ্যোগে এবং সরকারী উদ্যোগে শতকরা কত ভাগ তপশীলা জাতি বা উপজাতি কর্মী আছেন তার পরিসংখ্যান নেন। বেসরকারী সংস্থা তো কাজ ও গুণ দেখেই সচরাচর কর্মী নিয়োগ করেন। বেসরকারী সংস্থাতে তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। তা থেকেই বোঝা যাবে যে, তাঁরা গুণমানে চাকরি পান না অনেক ক্ষেত্রেই। আমাদের এতো বড় দেশে কোনো কাজই ছোটে নয়। কোনো কাজই বড় নয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রর মধ্যে আমি নিজে কোনদিনও তফাৎ দেখি না। দেখিনি। প্রমাণস্বরূপ বলতে পারি আমার বাড়িতে যারা কাজ করে তারা একজন জাতে রজক, অন্যজন ক্ষৌরকার এবং আরেকজন মেথর। এই কারণে আমার বাড়িতে

বিহারী এবং বাঙালী ব্রাহ্মণ রাঁধুনীর কাজ করতে চায় না। এমনকি অ-ব্রাহ্মণও করতে চায় না। যারা না করতে চায় তাদের ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিই। প্রত্যেক মানুষই যে সমান, জাত-পাত যাঁরা মানেন তাঁরা যে প্রকৃতার্থে অশিক্ষিত একথা শিশুকাল থেকেই আমার বাবা প্রথমে শিখিয়েছিলেন। আমাদের শেষ বাড়ির গৃহপ্রবেশের সময় ছত্তিশগড়িয়া কামিন, কুলি, মিস্ত্রী, ইট-বওয়া ছেলে সকলকেই বাবা নেমন্তন্ন করেছিলেন। একাসনে বসিয়ে খাইয়েছিলেন। তাতে আমাদের কিছু আত্মীয়স্বজন উষ্মা প্রকাশ করাতে বাবা বলেছিলেন, "আপনারা না খেয়ে চলে যেতে পারেন। এঁরা আমার সবচেয়ে বড় অতিথি।"

এতো কথা বলতে হলো এই কারণেই যে আমার বক্তব্যের কদর্থ করা অতি সোজা। দেশের সুরক্ষা, প্রশাসন, বিচার-ব্যবস্থা ইত্যাদিতে সবচেয়ে সেরা ছাত্রদেরই নেওয়া উচিত। নইলে দেশেরই ক্ষতি। সেরা ছাত্রদের না নিলে তাদের প্রতিও অবিচার করা হয়! এই কথা কোনো ব্যক্তিগত কারণে বলছি না। দেশের সামগ্রিক ভালোর জন্যেই বলছি।

চল্লিশ বছর চলে গেছে। এ নিয়ে এবারে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করার সময় এসেছে কী না তা আপনারাই ভেবে দেখবেন।

অনুচ্ছেদ ১৬ (খ)। "কোনো নাগরিককেই, ধর্ম, জাত, পাত, লিঙ্গ, জন্ম, জন্মস্থান বা বাসস্থানের বাবদে চাকরী দিতে অস্বীকার করলে চলবে না।"

কিন্তু চলছে তো। যখনই পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা করা কোনো অবাঙালী ব্যবসাদারদের বলি একটি বাঙালী ছেলেকে চাকরীতে নেবেন? মুখের ওপরে জবাব পাই, না। বাঙালী নেবো না।

এই অনুচ্ছেদ সরকার ঠিকভাবে মানছেন কি না তা আপনারাই ভোটের মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে বলুন। বাঙালী ছেলেদের চাকরী দেওয়ার অঙ্গীকার না করলে কোনো দলকেই ভোট দেবেন না।

অনুচ্ছেদ ১৬ (গ)/(ঘ)/(ঙ)। এই অনুচ্ছেদেই পার্লামেন্টকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে "আগের দুই অনুচ্ছেদে যাইই বলা হয়ে থাকুক না কেন ওঁরা ইচ্ছে করলে কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বী ও জাতিদের জন্যে বিশেষ

ব্যবস্থা করতে পারেন।" এবং যা ওঁরা করেছেন। প্রথমে এটা করা হয়েছিলো মহৎ উদ্দেশ্যে। এখন ভোট-হারানোর ভয়ে সিন্দবাদ নাবিকের মতো এই অনুচ্ছেদ চেপে বসেছে ঘাড়ে। নামায় কার সাধ্য ?

কিন্তু মুসলমানেরাও তো সংখ্যালঘু। তাদের জন্যেও কিছু করা নিশ্চয়ই উচিত ছিলো। অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি যে, এই বাবদে তাঁদের ন্যায্য ক্ষোভ আছে: তবে যে হারে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছে মনে হয় এইবার তাঁদের ভোটগুলি পাওয়ার "শিওর" রাস্তা হিসেবে কোনো নতুন নিদান ঢোকানো হবে। ভোট আর গদীই হচ্ছে মুখ্য। অন্য সবকিছুই গৌণ। আর পার্লামেন্ট ? "হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। আর না। না। না।" বাবুদের ব্যবহার দেখে তো মনে হয় না কখনও যে এটি পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। বরং মনে হয় জমিদার-সভা। যেখানে প্রধানমন্ত্রী জমিদার আর শাসকদলের মেম্বাররা তাঁর অন্ধ মোসাহেব। বিরোধী দলেরও সেই অবস্থা। দেশের ভালো করার জন্যে কোনো রেজোল্যুশান টেবলড্ হলেও সেই "না। না।" বাবুরা না না করে ওঠেন। দেশকে গুলী মারো। আমার দল থাকুক, আমার ক্ষমতা থাকুক, সদস্য থেকে আমি উপমন্ত্রী হই, উপমন্ত্রী থেকে মন্ত্রী। তবে না! তাই পদলেহন করেই চলি সব সময়। কোনো বেসরকারী অফিসের নিম্নতম কর্মচারীরও যেটুকু আত্মসম্মান, মেরুদণ্ড আছে—এই সব নব্য পার্লামেন্টারিয়ানদের তাও নেই। এঁদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় এঁরা মনুষ্যেতর জীব। অথচ পার্লামেন্টই তো একটা দেশের আয়না যাতে পুরো দেশের প্রতিবিম্ব পড়ে। এই গণতন্ত্র সম্বন্ধে অন্য গণতন্ত্রের মানুষেরা কি যে ভাবেন তা যদি আপনারা জানতেন!

<u>অনুচ্ছেদ ১৭</u>। "অস্পৃশ্যতা উঠিয়ে দেওয়া হলো দেশ থেকে।" কি ? বিশ্বাস হচ্ছে না ? "আনটাচেবিলিটি ইজ অ্যাবলিশড অ্যাণ্ড ইটস প্র্যাকটিস ইজ ফরবিডন্।"

হরিজনদের এখনও পুড়িয়ে মারা হচ্ছে বিশেষ করে বিহারে আর উত্তরপ্রদেশে। যে দুটি প্রদেশ থেকেই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক এম. পি. এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন দেশে আজ পর্যন্ত।

সংবিধান যে মানা হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে তাতো বুঝতেই পারছেন !

অনুচ্ছেদ ১৮। "কোনো খেতাব, মিলিটারী অথবা বিদ্যা-শিক্ষার ক্ষেত্রে আর দেবেন না রাষ্ট্র কাউকেই। কোনো ভারতবাসীই কোনো বিদেশী রাষ্ট্র থেকে কোনো খেতাব গ্রহণ করতে পারবেন না। ইত্যাদি।

পরমবীর চক্র. মহাবীর চক্র, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, পদ্মশ্রী এসব তাহলে কি ?·· বিভীষিকা ?"

স্বাধীনতার অধিকার

অনুচ্ছেদ ১৯। "ওল্ সিটিজেনস্ শ্যাল হ্যাভ দ্যা রাইট—"

(ক) "টু ফ্রীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্রেশান"

দেখা যাক আমার এই বই নিয়ে তাঁরা কি করেন ?

(খ) "টু অ্যাসেম্বল্ পীসেবলি এণ্ড উইদাউট আর্মস"

বিভিন্ন দল কি করে তাহলে লাঠি, বর্শা, নিযে লক্ষ মানুষের মিছিলের বন্দোবস্ত করে আমাদের মতো সাধারণ নির্বিরোধী মানুষদের মাঝে মাঝেই ভয় দেখান ? কি করে উর্দুকে সবকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়ার আন্দোলনে বিহারী মুসলমানেরা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে মিছিল এবং হৈ-হল্লা করেন এই কলকাতার বুকে ? তাঁদের ভাব দেখে মনে হয় যেন আমরা পাকিস্তানেরই অধিবাসী। অবশ্য জ্যোতিবাবু এ ব্যাপারটার খুবই শক্ত হাতে মোকাবিলা যে করেছিলেন তা পরম নিন্দুকও মানতে বাধ্য। উর্দু কিন্তু আমার অন্যতম প্রিয় ভাষা। এ কথার সত্যতা যাঁরাই আমার 'মাধুকরী' উপন্যাস পড়েছেন, তাঁরাই জানেন। ভাষার বিরুদ্ধে আমার কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু যে দেশে সংস্কৃতকে পর্যন্ত মানা হলো না রাষ্ট্রের তরফে সে দেশে উর্দুকেই বা মানা হবে কেন ?

(গ) "টু ফর্ম অ্যাসোসিয়েশনস অর ইউনিয়নস্"—

এই অনুচ্ছেদকে সীমিত করা উচিত। যে সব অ্যাসোসিয়েশান এবং ইউনিয়ন কাজ না-করতে বলে শুধুই মিছিল আর শ্লোগান দিয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত করেন তাঁদের বে-আইনী ঘোষণা করা উচিত।

(ঘ) "টু মুভ ফ্রীলি এনিহোয়ার ইন দ্যা টেরিটোরী অফ ইণ্ডিয়া।"

পারছেন কি ? দার্জিলিংএ বেড়াতে যাবেন কি এবারের গরমে ?

(ঙ) "টু রিসাইড এণ্ড সেটল ইন এনি পার্ট অ্যাণ্ড টেরিটোরী অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড অ্যাব্রড।"

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা অন্যান্য অনেক রাজ্য থেকেই কি বিতাড়িত হননি ? তাঁরা কি নিজেদের ইচ্ছায় উদ্বাস্তু হয়েছিলেন ? তাঁদের যখন মেরে তাড়ানো হলো তখন কেন্দ্র কি করছিলেন ?

(চ) "টু প্র্যাকটিস্ এনী প্রফেশান অর টু ক্যারী অন এনী অকুপেশান, ট্রেড অর বিজনেস।"

অনেকেই বোধ হয় এই অনুচ্ছেদের কথা জানেন না। জানলে তাঁদের উপর হয়রানী হলেই কেস ঠুকে দিতেন। "প্রফেশানের" মধ্যে যে "রাজনীতিও" পড়ে এই কথাটা স্পষ্ট করে লিখে দিলে এই পেশাটিও স্বীকৃতি পেতো। হিসেবে রাজনীতির কথা এই অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করেই উল্লেখ করা উচিত নয় কি ?

কালচারাল এ্যাণ্ড এডুকেশনাল রাইটস্

অনুচ্ছেদ ২৯ (১) "এনী সেকশান অফ দ্যা সিটিজেনস রিসাইডিং ইন টেরিটোরী অফ ইণ্ডিয়া অর এনী পার্ট দেয়ারঅফ হ্যাভিং আ ডিস্টিংট স্ক্রিপ্ট অর কালচার অফ দেয়ার ওন হ্যাভ দ্যা রাইট ট্যু কনসার্ভ দ্যা সেম।"

তাহলে বাংলার বাইরের অন্য অনেক রাজ্যে বাংলা স্কুলগুলির উপর হামলা হয় কেন ? পশ্চিমবঙ্গ তো সকলেরই। সারা ভারতকে আমরা হাসিমুখে না-খেয়ে না-পরে জায়গা করে দিয়েছি। অন্য রাজ্যে বঙ্গভাষাভাষীদেরও কি সমান স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয় ? অন্য কোনো রাজ্যের স্কুলেই বাংলা পড়াতে দেওয়া হয় না কেন ? বাংলা স্কুলগুলি সেইসব রাজ্যের সরকারী অনুদান পায় না কেন ?

অনুচ্ছেদ ৩০ (১) "ওল মাইনরিটিজ, হোয়েদার বেসড্ অন্ রিলিজন্ অর ল্যাঙ্গুইজ, শ্যাল হ্যাভ দ্যা রাইট ট্যু এস্টাব্লিশ এণ্ড অ্যাডমিনিস্টার এডুকেশনাল ইনস্টিট্যুশান্স্ অফ দেয়ার চয়েস।"

অনুচ্ছেদ ৩০ (২)। "রাজ্য যখন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানকে কোনো অনুদান দেবেন তখন সংখ্যালঘু ধর্ম বা ভাষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে বঞ্চিত করতে পারবেন না।"

এই বাবদে ও পাওনার ব্যাপারে সব জায়গাযই বৈষম্য হচ্ছে। বিশেষ করে বাঙালীদের বিরুদ্ধে।

ডাইরেক্‌টিভ প্রিন্সিপ্যালস্ অফ দ্যা স্টেট

অনুচ্ছেদ ৩৮ (১)। "রাষ্ট্র এমনই এক সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করবেন যা ওয়েলফেয়ার স্টেট হবে এবং জাতীয় সমস্ত সংস্থা ন্যায়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ওয়েলফেয়ার যাতে বজায় থাকে তা দেখবেন।"

অনুচ্ছেদ ৩৮ (২)। "আয়ের অসমতা, স্ট্যাটাস-এর অসমতা, সুযোগের অসমতা, শুধুমাত্র ব্যক্তির মধ্যে নয়, নানা গোষ্ঠীর মধ্যেও যাতে দূরীকৃত হয় তা দেখবেন।"

অনুচ্ছেদ ৩৯। "দ্যা স্টেট, শ্যাল, ইন পার্টিকুলার, ডাইরেক্ট ইটস পলিসী টুওয়ার্ডস সিকিওরিং :"

অনুচ্ছেদ ৩৯ (ক)। "দ্যাট দ্যা সিটিজেনস্, মেন অ্যাণ্ড উওমেন ইকুয়ালি হ্যাভ দ্যা রাইট টু্য অ্যান্ অ্যাডেকুয়েট মীনস অফ লাইভলিহুড।"

অনুচ্ছেদ ৩৯ (খ)। "দ্যাট দ্যা ওনারশিপ এ্যাণ্ড কন্ট্রোল অফ দ্যা মেটেরিয়াল রিসোর্সেস্ অব দ্যা কমিউনিটি আর সো 'ডিস্ট্রিবিউটেড এ্যাজ বেস্ট অ্যাজ টু শেয়ার দ্যা কমন গুড্।"

এখনও দেশের অধিকাংশ লোক না খেয়ে থাকে। কোটি কোটি বেকার। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ঠাকুর্দা আমাদের ধৈর্য ধরতে বলেছিলেন। মাও বলেছিলেন। এখন তিনিও বলছেন। ধৈর্যর মতো বড় গুণ ভারতীয়দের আর নেই।

অনুচ্ছেদ ৩৯ (গ)। "দ্যাট দ্যা অপারেশন অফ দ্যা ইকনমিক সীস্টেম ডাজ নট রেজাল্ট্ ইন দ্যা কন্‌সেনট্রেশান অফ ওয়েল্‌থ অ্যাণ্ড মীনস্ অফ প্রডাকশান্ টু দ্যা কমোন ডেট্রিমেণ্ট।"

তাতো বটেই! তাই বাংলা ভাগ হবার পর থেকেই বাংলাকে গরীবস্য গরীব করার চক্রান্তে কেন্দ্র লিপ্ত হয়েছিলেন। শুধু বাংলা নয়, সমস্ত পূর্বাঞ্চলকে বঞ্চিত করে সমস্ত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স চলে গেছিল মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে এবং তামিলনাড়ুতে। কয়েকটি পরিবারের হাতে জাতীয় পুঁজি কুক্ষিগত হয়েছে। তাদের মধ্যে একমাত্র টাটাদের সম্বন্ধে কারো কোনো বক্তব্য থাকার কথা নয়। অমন পুঁজিপতি দেশে আরও থাকলে দেশের সত্যিকারের মঙ্গল হতো। দার্জিলিং এ বিদেশি ভ্রমণকারীরা আসতে যাতে না পারেন সেজন্যে সবরকম বাধার সৃষ্টি করা হয়েছিলো। আজ ঘিসং কেন যে বাংলার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন তা জানি না। সমস্ত পূর্বাঞ্চলকে আসাম, ওড়িশা, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা, মনিপুরকে এবং কিছুটা বিহারকেও যেমন ভাবে পরিকল্পিত বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল তা অন্যত্র বলব। কেন্দ্রর লজ্জাবোধ পর্যন্ত লোপ পেয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩৯ (ঘ) "দ্যাট দেয়ার ইজ ইকুয়াল পে ফর ইকুয়াল ওয়ার্ক ফর মেন অ্যাণ্ড উইমেন।"

প্রত্যেক জায়গায় বিশেষ করে শারীরিক শ্রমের ব্যাপারে এই বৈষম্য আজও আছে। কুলিরা সব সময়ই কামিনদের চেয়ে বেশি রুজী পায়। কেন্দ্র কি জানেন না তা?

অনুচ্ছেদ ৩৯ (ঙ)। "শিশুদের প্রতি দরদ।"

স্বাস্থ্য তো শ্রমিকদের চমৎকারই আছে। টাটাদের মতো দু একটি বেসরকারী প্রগতিশীল উদ্যোগ ব্যতীত সব শ্রমিকদেরই স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকার এবং মালিকরা কতখানি সচেতন তা আপনারা জানেনই।

অনুচ্ছেদ ৩৯ (ক) "রাষ্ট্র দেখবে যে, প্রত্যেকে সমান বিচার পায় এবং বিচার পেতে তাদের বিনিপয়সার আইনজ্ঞদের পরামর্শ ও সাহায্য দেওয়া যায়। এমন সব আইন প্রণয়ন করা হবে যাতে নাগরিকদের কারো প্রতিই "জাস্টিস ইজ নট ডিনায়েড"।

মরিমরি! জেলের মধ্যে এদেশে কয়েদিদের অন্ধ করা হয়, মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়, শিশুদেরও। আজকেও।

এখনও টাকা যার, জোর তার, বিচারও তার। আর দলের দাদা যার, বিচার তো তার দোরে বাঁধাই আছে। ডাইবেকটিভ প্রিন্সিপ্যালস চল্লিশ বছর পরেও আইনেরই মতো তামাশা হয়ে আছে। লজ্জাহীনদেবও কিছু লজ্জা থাকে। কিন্তু এঁদের তাও নেই!

সংবিধানে কেন্দ্রকে সবচেয়ে ক্ষমতাবান করা হয়েছে। রাজ্যগুলিকে দুর্বল। ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজম্ এর বদলে এখন আমরা দিল্লীব কলোনিয়ালিজম্ এ বাস কবছি। আমরা যেন ভিখিরি। প্রধানমন্ত্রীর দয়ায়, তাঁর ক্ষমা-ঘেন্নায়ই বেঁচে আছি। তাঁর ঘন ঘন স্পেশ্যাল প্লেন আর হেলিকপটারের সফরের শেষে তাঁর মায়ের জমিদারীরই কোটি কোটি টাকা যেন অনুকম্পার সঙ্গে আমাদের দান কবে যাচ্ছেন তিনি।

অর্থনৈতিক দিক নিয়ে পরে বলছি। প্রমাণ সমেত আপনাদেব দেখাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কী দুর্ব্যবহাব কেন্দ্র করেছেন। আপাতত বলি যে, কোলকাতায় যা কিছু ঘটেছে সাম্প্রতিক অতীতে, পাতাল রেল, সি. এম. ডি এ দ্বিতীয় হাওড়া ব্রিজ-এ সবও কেন্দ্র নিজ থেকে দেননি। যে তরুণ, মেধাবী, ছেলেগুলোর কথা আমরা ভুলে গেছি, যাদের মা-বাবাদের জন্যে আমাদেব কণামাত্র সমবেদনা, অনুকম্পা ও দরদ আজ নেই সেই পাগল নকশাল ছেলেগুলোর টাটকা তাজা রক্তর রঙ দেখে কেন্দ্র ভীত হয়েই পাশ্চমবঙ্গর কাছে দৌড়ে এসেছিলেন। তার আগে পর্যন্ত অবধি ঘুমিয়েই ছিলেন কেন কেন্দ্রীয় সরকার? কেন এতো এবং এতোরকম বৈষম্য চালিয়ে গেছিলেন পশ্চিমবঙ্গর বিরুদ্ধে—তার জবাব কে দেবে?

না। আমি সন্ত্রাসবাদী নই। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে, সন্ত্রাসবাদী যারা, তারাই তো জিতছে। মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর। এখন দার্জিলিং এর ঘিসিং। ঘিসিং কেবলই হুম্‌কি দিচ্ছেন যে "আমরা রাইফেল ছুঁড়তে জানি"। অমনি রাজীবের সুর নবম হয়ে যাচ্ছে। রাইফেল্স ছোঁড়া, একদিন তো বাংলা আর পাঞ্জাবই সারা দেশকে শিখিয়েছিলো। তাই নয় কি?

শিখদের মতো এমন সাহসী, বীর যোদ্ধার জাতকে, আমাদের পরম

বন্ধুকেও ; রাজনৈতিক ফায়দা ওঠাতে প্রধানমন্ত্রী শত্রুতে রূপান্তরিত করে দিলেন। "অপারেশান ব্লু-স্টারের" অনেকের মতে দরকার ছিলো না। ভিন্দ্রানওয়ালার তো অনেক প্রশংসাও শুনেছিলেন আপনারা ওঁদেরই কারো কারো মুখে। একসময়। স্বর্ণমন্দিরে যে অস্ত্র জমা হচ্ছে তা কি উনি আগে জানতেন না? সবই জানতেন কিন্তু কিছু বলেননি এই ভেবেই যে অপারেশান ব্লু-স্টার দিয়েই নির্বাচনে জয়ী হবেন। ঐ হবে তাঁর তুরুপের তাস। তাঁর দাবার চাল একবার অন্তত ভুল বলে প্রমাণিত হলো। কিন্তু ভারতের শস্য-ভাণ্ডার যাদের, সেই আমাদের প্রত্যেকের পরম বন্ধু শিখদের আর পাঞ্জাবীদের মধ্যে ভায়ের সঙ্গে ভায়ের লড়াই তো ঐ দাবার চাল না চাললে এড়ানো যেত। শুধু স্বর্ণমন্দির কেন, অন্যান্য অনেক ধর্মস্থানেই যে অস্ত্র আজও মজুত আছে তা কি কেন্দ্রের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট জানেন না? জানলে, এখনই সেখানে কিছু করা হচ্ছে না কেন? কংগ্রেস নির্বাচনে জিতলো ইন্দিরার নৃশংস মৃত্যুর কারণে এবং ভারতীয় নরম-মনের, নারীর প্রতি গভীর সম্মানজ্ঞানের জনগণকে তিনদিন ধরে এক গুলিবিদ্ধ মহিলার মৃতদেহ দেখিয়ে। নইলে, নির্বাচনে কি হতো বলা যায় না!

তবে আবারও বলব, রাজীব মায়ের মৃত্যুর পর যে স্থৈর্য দেখিয়েছেন তাতে তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা অসীমই হয়েছিলো। রাজীব যে অন্য ধাতুর মানুষ তা প্রমাণ করেছিলেন সারা পৃথিবীর কাছে। এবং রাজীব হয়তো ওঁদের পরিবারে একজন ব্যতিক্রমী পুরুষও। ওঁর মধ্যে ফিরোজ গান্ধী যতটা আছেন ইন্দিরা হয়তো ততখানি নেই। ওঁকে সৎ, দৃঢ় নতুন প্রজন্মর মানুষ বলেই মনে হয়।

জানি না, আমি ঠিক কী না!

কিন্তু ভারতে যদি প্রকৃত গণতন্ত্রই থেকে থাকে তো রাজীবকেই প্রধানমন্ত্রী করা হলো কেন? তাও কি ঐ সমবেদনা বশতঃই? না কী পার্লামেন্টের বেশির ভাগ সভ্য এবং কেন্দ্রের বেশির ভাগ মন্ত্রীরই অনেক গোপন-কথা আছে, আছে অনেকেই লুকোনো ধন-দৌলত, হিসাব-বহির্ভূত? ব্ল্যাক-মেইলড্ হতে পারেন সেই ভয়েই কি সবাই বাধ্য

ছেলের মতো নেহরু ডায়নাস্টিকেই আবারও কায়েম করলেন? পৃথিবীর কোনো গণতন্ত্রর ইতিহাসে একটিই পরিবার প্রায় চল্লিশ বছর এমন জমিদারী কায়দায় গণতন্ত্র চালাননি।

অবশ্য এ দেশের ভীরু মেরুদণ্ডহীন জনগণের যেমন নেতৃত্বর অধিকার তেমন নেতৃত্বই তাঁরা পেয়ে এসেছেন। "ইউ গেট দ্যা গভর্ণমেণ্ট ইউ ডিসার্ভ"। ইন্দিরার এমার্জেন্সীর সময় ভারতীয়দের, ভারতীয় সংবাদপত্রর, ভারতীয় নেতৃত্বর পরীক্ষা হয়ে গেছে। আনন্দবাজারের দুজন সাংবাদিককে জেলে যেতে হয়েছিলো সেই সময়ে। ওঁরা, "দ্যা স্টেটসম্যান" এবং "ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস" ছাড়া অন্যরা তো চুপ করেই ছিলেন। স্টেটসম্যানকে কম নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা হয়নি। সংবাদপত্র যদি তার স্বাধীনতা ব্যবহারই না করে দেশের প্রকৃত বিপদের দিনে, তবে সেই স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্যই নষ্ট হয়ে যায়। গণতন্ত্রর মুখ্য পাহারাদার সংবাদপত্র। দেশের ঝড়-ঝঞ্ঝার দিনে সেই ভূমিকার কথা নিশ্চয়ই মনে রাখা উচিত।

এই দেশে কোনো ইন্দিরা গান্ধীর দরকার ছিলো না। যে-কোনো সার্কাসের লোক লম্বা চাবুক হাতে উঁচু টুলের উপর দাঁড়িয়ে সপাং-সপাং আওয়াজ করলেই আমরা কুকুরের মতো হাঁটু-মুড়ে বসে তার পদলেহন করি। চাবুক আমাদের গায়ে লাগারও দরকার নেই। শব্দই যথেষ্ট। এই রকম দেশে, এই রকম নেতাদের রাজত্বে এই রকম মেরুদণ্ডহীন জনগণের আমলে এমনই ঘটবে বার বার। কেউই নিজেরটা ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। নিজের পকেট, নিজের সম্পত্তি, নিজের গদী, নিজের ক্ষমতা। ব্যসস্ ঐটুকুই।

পরের প্রজন্মর কথা কি আমরা কেউই ভাবি না? কোন্ দেশে, কাদের হাতে আমরা ছেড়ে যাচ্ছি আমাদের ছেলেমেয়েদের? তাদের আমরা মানুষের মতো মানুষ দেখতে চাই? না চড়াই-পাখি? অথবা কুকুর?

এই প্রশ্নর উত্তর আপনারই ভোটের মধ্যে আছে। ভোট দেওয়ার পরে ভোট যাকে দিলেন তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়ার

মধ্যেই আছে। উত্তর আপনারাই ঠিক করুন। মতাদর্শে আপনি কম্যু'নস্ট হতে পারেন, কংগ্রেসী হতে পারেন, নকশাল হতে পারেন, কিছুই না হতে পারেন ; সে সব আপনারই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সবার আগে মানুষ হন। ভারতবাসী হন। বাঙালী হন। এই সার্কাসের ক্লাউনদের হাতে আপনার নিজের ও ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেবেন না। নিজের জোর ফলান। গণতন্ত্রে আপনিই সবচেয়ে বড় ভি-আই-পি। যিনি ভোট দেন। ভোট যিনি পান তিনি আপনার একজন সেবকমাত্র। আপনার কাছে জবাবদিহি করা তাঁর কর্তব্য। ভোট দেবার আগে স্পষ্ট করে বারবার তাঁকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বলুন। বলুন যে, আপনারা মানুষের মতো বাঁচতে চান। এবং তা দেখার জন্যেই আপনারা প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছেন। তিনি যদি ভোট পাবার পর কিছুই না করেন তঁকে সামাজিক ভাবে বয়কট করুন। তাঁর জীবন দুর্বিষহ করে তুলুন। বুঝিয়ে দিন যে, ভোটদাতারা আর ঘুমিয়ে নেই।

সংবিধান নতুন করে লেখবার সময় নিশ্চয়ই হয়েছে। নতুন সংবিধানে একটি ধারা রাখা উচিত যাতে অ্যাসেমব্লী বা পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি তাঁদের পাঁচ বছরের মেয়াদকালে অলস বা অকর্মণ্য বা অসৎ বলে ভোটদাতাদের দ্বারা বিবেচিত হন তবে মেয়াদ শেষ হবার আগেই তাঁদের ফিরিয়ে আনা বা "রিকল্" করা যাবে। এবং সেই কেন্দ্রে আবার নতুন করে নির্বাচন হবে। এইটি করা গেলে এই গণতন্ত্রের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে পাঁচ-বছর-মেয়াদী জমিদারীতে আসীন হয়ে যা খুশি তাইই করে যেতে পারেন, যাঁরা তাঁদের নির্বাচন করে পাঠালেন তাঁদের কথাই ভুলে গিয়ে ; সেটা হয়তো বন্ধ হবে।

ঠিক কি ভাবে এই অনুচ্ছেদ আনা হতে পারে তা আপনারাই ভেবে দেখবেন।

হেনরী ডেভিড থোরো তাঁর "সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স"-এ বলেছিলেন :

> "নট্ আ ড্রাম ওজ্ হার্ড, নট আ ফিউন্যারাল নোট,
> অ্যাজ হিজ কর্স টু দ্য র‍্যাম্পার্ট ; উই ক্যারীড

নট্‌ আ সোল্‌জার্‌ ডিস্‌চার্জড্‌ হিজ ফেয়ারওয়েল শট্‌
ওভার হ্যা গ্রেভ হোয়্যার আওয়ার হীরো উই ব্যেরীড।"

"হ্যা মাস অফ মেন সার্ভ হ্যা স্টেট দাস, নট অ্যাজ মেন মেইনলি, বাট অ্যাজ মেশিনস্‌, উইথ দেয়ার বডিজ। দে আর হ্যা স্টাণ্ডিং আর্মি, অ্যাণ্ড হ্যা মিলিশিয়া, জেইলরস্‌, কনস্টেবল্‌স্‌, পোজে কমিট্যাটাস্‌, এট্‌সেট্রা। ইন মোস্ট কেসেস দেয়ার আর নো ফ্রী এক্সারসাইজ হেয়োটেভার অফ হ্যা জাজমেণ্ট অর অফ হ্যা মর‍্যাল সেন্স; বাট দে পুট দেম্‌সেল্‌ভস্‌ অন্‌ আ লেভেল উইথ উড অ্যাণ্ড আর্থ অ্যাণ্ড স্টোন্‌স্‌; অ্যাণ্ড উডেন মেন ক্যান্‌ পারহ্যাপস্‌ বী ম্যানুফ্যাকচারড্‌ হ্যাট্‌ উইল্‌ সার্ভ হ্যা পারপাজ অ্যাজ ওয়েল। সাচ কম্যাণ্ড নো মোর রেসপেক্ট হ্যান মেন অফ স্ট্র অর আ লাম্প অফ ডার্ট। দে হ্যাভ হ্যা সেম্‌ সর্ট্‌ অফ ওয়ার্থ ওন্‌লী অ্যাজ হর্সেস্‌ অ্যাণ্ড ডগস্‌। ইয়েট্‌ সাচ্‌ অ্যাজ দীজ্‌ ইভিন আর কমোনলী এস্টীমড্‌ গুড্‌ সিটিজেনস্‌। আদার্স—অ্যাজ মোস্ট লেজিস্‌লেটরস, পোলিটিসিয়ান্‌স্‌, লয়ার্‌স্‌, মিনিস্টারস্‌, অ্যাণ্ড অফিস-হোল্‌ডারস্‌—সার্ভ হ্যা স্টেট চিফ্‌লি উইথ দেয়ার হেডস; অ্যাণ্ড, অ্যাজ দে রেয়ারলি মেক এনি মরাল ডিসটিংশানস্‌, দে আর অ্যাজ লাইকলি ট্যু সার্ভ হ্যা ডেভিল, উইদাউট ইন্‌টেণ্ডিং ইট, অ্যাজ গড। আ ভেরী ফিউ, অ্যাজ হীরোজ, প্যাট্রিয়টস্‌, মার্টারস্‌ রিফর্মাস্‌ ইন হ্যা গ্রেট সেন্স, অ্যাণ্ড মেন্‌, সার্ভ হ্যা স্টেট উইথ দেয়ার্‌ কনসেন্সেস ওলসো, অ্যাণ্ড সো নেসেসারিলি রেজিস্ট ইট ফর্‌ হ্যা মোস্ট পার্ট; অ্যাণ্ড দে আর কমোনলী ট্রীটেড অ্যাজ এনিমীজ বাই ইট। আ ওয়াইস ম্যান্‌ উইল ওনলী বী ইউসফুল্‌ অ্যাজ আ ম্যান, অ্যাণ্ড উইল নট সাবমিট টু বী "ক্লে", অ্যাণ্ড স্টপ আ হোল টু কীপ হ্যা উইণ্ড এওয়ে বাট লীভ হ্যাট অফিস টু বী জাস্ট অ্যাট্‌ লীস্ট :—

"আই অ্যাম ট্যু হাই-বর্ণ টু বী প্রপার্টিড্‌,
টু বা আ সেকেণ্ডারী অ্যাট্‌ কন্‌ট্রোল,
অর ইউসফুল্‌ সার্ভিং-ম্যান্‌ অ্যাণ্ড ইন্সট্রুমেণ্ট্‌
টু এনী সভারিন্‌ স্টেট থ্রু-আউট হ্যা ওয়ার্লর্ড্‌।"

"কত বর্ষার রাতে যারা অনাহারে কাটিয়েচে……সারাজীবন যারা পরের গোলাম হয়ে নত মাথায় পাদুকার ধূলা শীর্ণ হাতে মুছে নিয়েছে ……চিরদিন ভালোবেসে যারা প্রতিদানে পেয়েচে অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য আর ঔদাসীন্য, শান্ত নদীর শ্যামকূলের চিতায় যাদের কচি জীবনের আশা ফুরিয়েছে…কত শিশু যাদের কচি হাসি শিশু-বয়সের সাধে আহ্লাদে উজ্জ্বল হয়েছিল……সারাজীবন যারা আনন্দের পেছনে পেছনে ঘুরেচে কিন্তু আলেয়ার মত আনন্দ যাদের থেকে দূরে দূরে চলে বেড়িয়েচে চিরদিন গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে অন্ধকার রাত্রে ব্যর্থ প্রেমের অশ্রুতীর্থ যাদের দীর্ঘশ্বাসে ভরে নিয়েচে……যারা ছিল দুরন্ত, দস্যু, পাপী, অজ্ঞান-তারা যারা সারাজীবন ধরে পরের কৃপা ও পাপের বোঝা বয়ে ফিরেচে সে সব ব্যর্থ, লুপ্ত, অসুখী দীন জীবের জন্যে এখানে থাকবে এক স্মৃতিস্তম্ভ, অনন্তের কোণে তা চিরদিন থেকে যাবে।"

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (হলুদ পাতা)

(আনন্দবাজারের বার্ষিক সংখ্যায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত)

আজ অবধি যে ধরনের লেখালেখি করেছি তার সঙ্গে এই বইটির কোনোরকম মিলই নেই। যদিও এই সব প্রসঙ্গ গত বাইশ তেইশ বছরে আমার বহু গল্প এবং উপন্যাসেই এসেছে। নাম করে বলতে হলে বলতে পারি 'আয়নার সামনে', 'ছু নম্বর', 'বিন্যাস', 'জঙ্গলের জার্নাল' (পুরাণাকোট, অংগুল, ওড়িশা) 'সোপর্দ', 'কোজাগর', এবং 'বাঘের মাংস'। 'ঋতুর শ্রাবণ'ও।

প্রথম কৈশোর থেকে শিকারের শখ থাকায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যন্তরের গ্রাম ও ছোট ছোট জনপদে অনেকবার গিয়েছি এবং থেকেছি। বিশেষ করে, পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে। সেই সব অনামা অখ্যাত জায়গার সাধারণ ভারতবাসীর জীবন-যাত্রা, তাদের অবিশ্বাস্য দারিদ্র, তাদের হতাশা, অসহায়তার সঙ্গে তাদের ভাগ্যকে মেনে নেবার নীরব দুর্মর অভ্যেস আমাকে যৌবনের দিনগুলি থেকে বড়ই ব্যথিত করেছে। তাদের সমব্যথী করে তুলেছে নিজেরই অজানিতে।

এতো বছর পরও তাদের অবস্থার প্রায় কিছুই উন্নতি হয়নি। বুলি-সর্বস্ব, ভাণ-সর্বস্ব, গদী-লোভী রাজনৈতিক নেতারা তাদের নিজ নিজ পকেট, নিজ-নিজ দল, নিজদলীয় 'ইজম্' নিয়ে এতোখানিই মত্ত থেকেছেন যে, গ্রামগঞ্জ তো বটেই শহরের সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষদের জীবনও এক সম্পূর্ণ অচলাবস্থাতেই এসে পৌঁছেছে। মধ্যবিত্তরা, যাঁরা চিরদিন সমাজের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন জীবনের বিভিন্ন বহির্মুখী ও অন্তঃর্মুখী ক্ষেত্রে তাঁরাই আজ মুছে যেতে বসেছেন।

এতো কথা বলার কারণ, সাহিত্য-অসংক্রান্ত এই লেখা হঠাৎ আমি কেন লিখতে বসলাম তারই জবাবদিহি হিসেবে। বাঙলা ভাষায় লেখালেখি করা অনেক জনপ্রিয় সাহিত্যিক ও কবিই তাঁদের যে সমাজ ও দেশের প্রতি কোনো দায়িত্ব কর্তব্য আছে এ কথাটা অস্বীকার করেন। শিল্পীর কাছে 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' এই কথাটাই সবচেয়ে বড় বলে তাঁরা মনে করেন। এবং বলেনও।

আমার তাঁদের কারো প্রতিই বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা বা অসূয়া নেই। তবে আমার ব্যক্তিগত মত এইই যে, লেখক যদি নিজস্ব স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হন তবে তাঁকে তাঁর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে কোনো এসটাব্লিশমেন্ট তো বটেই, কেন্দ্রর বা রাজ্য সরকারের তাঁবেদারী করাটাও মানায় না। কোনো প্রকৃত শিল্পীকেই কোনোদিনও দেখা যায়নি রাজা বা সরকারের তাঁবেদারী করতে।

এই মেডিয়া-সর্বস্ব দিনেও, মেডিয়া যত শক্তিশালীই হোক না

কেন কিছু তাঁবেদার লেখককে মেডিয়াও যে চিরদিনই সম্মানের আসনে বসিয়ে রাখতে পারবে একথাও মনে হয় না ইতিহাসের শিক্ষা মেনে নিলে।

আবার উল্টোটাও বিশ্বাস হয় না। লেখকের যদি সত্যিই বলার মতো কিছু থাকে, তবে মেডিয়া, সরকার বা বিরোধীপক্ষও তাঁকে দাবিয়ে রাখতে পারেন না। লেখকের সম্পর্ক পাঠকেরই সঙ্গে। পাঠক যদি সে লেখা পড়তে চান তবে তাঁরা যে ভাবেই হোক পড়বেনই।

আমি বিশ্বাস করি যে একজন সামান্য লেখক হিসেবে, সমসময়, সমকাল এবং আমার পরবর্তী একাধিক প্রজন্মর প্রতি আমার কিছু কিছু কর্তব্যও আছে যার পরিধি শুধুমাত্র "আর্ট ফর আর্টস্ সেক"-এর মাত্রাকে অবশ্যই অতিক্রম করে যায়।

আমার এই বিরাট সুন্দর স্বরাট দেশকে আমি ভালোবাসি। অধুনা বাংলাদেশ, যেখানে আমার পিতৃপুরুষের নিবাস ছিলো ; সেই বাংলাদেশকে যেমন ভালোবাসি এই বাংলাকেও তেমনই ভালোবাসি। আমি বাঙালী। বাঙলা ভাষা আমার মাতৃভাষা। বাঙলা গান আমার গলার গান। এই সব কারণে আমার গর্বের অন্ত নেই। কিন্তু আমি যতখানি বাঙালী তার চেয়ে একটুও কম ভারতীয়ও নই।

ভারতবর্ষকে আমি আমার পরলোকগতা মায়ের মতোই ভালোবাসি। সম্মান করি।

এই বাক্যর মানে যার যেমন বুদ্ধি তেমন করে বুঝে নেবেন। ব্যাখ্যা করবার ইচ্ছা রাখি না। পরলোকগতা মায়ের স্মৃতিকে টুকরো করা কারো পক্ষেই অভিপ্রেতও নয়।

পূর্বাঞ্চলের একাধিক ভাষায় আমি মোটামুটি কথা বলতে পারি বলেই সাধারণ মানুষের মনের খুব কাছে পৌঁছতেও আমার কখনওই অসুবিধা হয়নি কোনো।

কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ ছাড়া এই দেশের অধিকাংশ বড়লোককে দেখে আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে ভারতবর্ষে বামপন্থীদের কম্যুনিজম আনতে হবে না, দিশী বড়লোকদের অন্ধত্ব, অসীম লোভ

এবং অন্য মানুষের সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহারই সমস্ত ভারতবর্ষকে হয়তো কম্যুনিস্ট করে তুলবে একদিন। এই কথাটা বড়লোকদের এক বিরাট অংশ যদি একটুও বোঝার চেষ্টা করতেন! তাহলে তাঁদেরও ভালো হতো।

বাঙালী কিন্তু নন। আদৌ প্রাদেশিক বলেননি সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে অন্য প্রদেশীয়দের তুলনায় খুব কম বাঙালীই প্রাদেশিকতা রোগে ভোগেন। বরং আমি বলব যে তাঁদের মূল দোষ হলো "কূপমণ্ডুকতা"। এবং গৌণ দোষগুলির মধ্যে অশেষ সহ্যশক্তি, অদূরদৃষ্টি, অলসতা, অনিয়মানুবর্তিতা এবং ছড়ানো-মস্তিষ্কতা। বাঙালী হচ্ছে সোডার বোতলের জাত। ছিপি খুললেই ভুসভুস করে কিছুক্ষণ সজোরে গ্যাস বেরোবার পর, বুড়বুড়ির পরাকাষ্ঠার পর; বিড়বিড়-করা স্বগতোক্তিরই মতো কিছুক্ষণ সজাগ থেকেই বাঙালী পরমুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়ে। এবং এই ঘুমের সুযোগ ব্রিটিশরা যেমন নিয়েছিলো তেমন নিয়েছে অন্যান্য ভারতীয়রা। এবং দিল্লী তো বটেই।

কলকাতায় একটি দেওয়ালে লিখন দেখেছিলাম: "বাঙালী জেগে ওঠো"। তার নিচেই অন্য কোনো বাঙালীই লিখেছিলেন: "কাঁচা ঘুম ভাঙিও না"।

হয়তো এই দেওয়াল লিখন দুটিই বাঙালীর চরিত্রর বিশ্লেষণ। হঠাৎ জেগে ওঠার ইচ্ছেয় উদ্দীপ্ত কোনো বাঙালী ঐ প্রথম লিখনটি লিখেছিলেন। কিন্তু অন্যজন তার নিচে "কাঁচা ঘুম ভাঙিও না" লিখে বাঙালীর আর সব কিছু হারালেও 'সেন্স-অফ-হিউমার' যে সে হারায়নি এবং বাঙালী যে আদৌ প্রদেশ-মনস্ক জাত নয় এই দুই সত্যই একসঙ্গে প্রমাণিত করেছেন। এই সেন্স অফ হিউমারের কারণেই বাঙালী এত দুঃখ-কষ্টর মধ্যে এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু বড় করুণ এই বেঁচে-থাকা। বাসে, ট্রামে, লোক্যাল ট্রেনে, কোটি কোটি মানুষ কোনো সভ্য দেশের পক্ষে অভাবনীয়, অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে ম্লান পাণ্ডুর রক্তশূন্য মুখে সামান্য আয়ের এবং অ-বাঙালীদের ব্যবসার চাকর হয়ে প্রতিদিন অফিস পাড়ায় আসেন এবং বাড়ি ফেরেন দূর

দূরান্তর থেকে।

সেন্স অফ হিউমারেরও বিস্তৃতির, সম্প্রসারণের কোনো সীমা নিশ্চয়ই আছে। আরও কতদিন বাঙালী হেসে ও রসিকতা করে এই মনুষ্যেতর জীবন মেনে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন তা আমি জানি না। বিস্ফোরণের সময় সত্যিই হয়তো এসে গেছে।

এমনই এক সময়ে আমরা এসে পৌঁছেছি যখন "কাঁচা ঘুম ভাঙিও না" না লিখে : "কুম্ভকর্ণর ঘুম ভাঙবে না" এমন কথা কোনো বাঙালীর লেখা উচিত ছিলো। এই ঘুম কুম্ভকর্ণর ঘুমও নয়! একে কালঘুম বলাই ঠিক!

এই ঘুম সত্যিই কি ভাঙবে কোনোদিন? কে ভাঙাবে? নেতা কোথায়? মানুষ কোথায়? বাঙালী আজ নিজের অস্তিত্বর চরমতম সংকটে পৌঁছেও, অভুক্ত থেকেও, নিরন্তর অপমানিত হয়েও; লক্ষ লক্ষ বেকার ছেলেদের এবং অনূঢ়া মেয়েদের নিয়ে দুশ্চিন্তাতে রাত জেগেও; অনেকই মেয়েকে চোখের সামনে শুধু অর্থনৈতিক কারণেই নষ্ট হয়ে যেতে দেখেও ঘুমিয়েই আছে। এমন সর্বংসহ, নির্বিষ, প্রতিবাদহীন ঢোঁড়া-সাপের জাত ভারতে আর আছে কী না সন্দেহ।

না। সন্ত্রাসবাদে আমি বিশ্বাস করি না।

কিন্তু বাঙালীই যে সমস্ত ভারতবর্ষকে একদিন সন্ত্রাসবাদের পথ দেখিয়েছিলো এ কথাটা অন্যদের মনে করার সময় হয়েছে। আশা করব, বাঙালীকে সন্ত্রাসবাদের দিকে ঠেলে দিতে বাধ্য করা হবে না। আজকে যদিও, নকশাল ছেলেদের দাপাদাপির পর বাঙালী আবার লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমিয়েই আছে কিন্তু বর্গী যদি আসে, রোজই আসে, নিরন্তর অপমান, অসম্মান, লুণ্ঠন করতেই থাকে তখনও কি লক্ষ্মী ছেলেরা ঘুমিয়েই থাকবে?

বাঙালী মায়েরাও কি অঘোর ঘুমে? বাঙালী ছেলে-মেয়েদের বাবারাও অন্যর দয়ানির্ভর চাকরীর গ্লানিময় কিছু টাকা মাসান্তে ঘরে এনে নিজেদের লজ্জা, মান, বিবেক, আত্মসম্মানজ্ঞান সব খুইয়ে ফেলেও কি করে ভাত খান দুবেলা তা ভাবলেও গা-গুলিয়ে ওঠে।

আবারও বলছি, সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস আমি করি না।

সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস ইহুদিরাও করতেন না। নাৎসী—জার্মানীর অত্যাচারে সেই জাতকে শুধুমাত্র বেঁচে থাকারই জন্যে, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার কারণে "ইজরায়েল" গড়তে হয়েছিলো মরুভূমির মধ্যে। তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রাখতে। জাতের গুণে মরুভূমির মধ্যেই সোনা ফললো। কারণ তাঁদের মেরুদণ্ড ছিলো। বাঁচার জেদ ছিলো।

আমার জিজ্ঞাস্য সব বাঙালীদেরই কাছে শুধু এইটুকুই: তাঁরা কি করবেন ভাবছেন? তাঁরা মানুষের মতো বাঁচবেন না কুকুরের মতো মরবেন?

বাঙালীদের বিভিন্ন রাজ্য এমনকি বহু-কর্তিত বাংলার বিভিন্ন এলাকা থেকেও উদ্বাস্তু যে হতে হচ্ছে এ সম্বন্ধে তাঁরা কি কিছু ভাবছেন? তাঁদের ঘুম ভাঙবে কখন? বঙ্গোপসাগরের জলে হ্যামলীনের বাঁশিওয়ালা যেমন ইঁদুরের পালকে তাড়িয়ে নিয়ে নদীতে ফেলে মেরেছিলেন তেমনই করে তাড়িত হয়ে জলে যখন পড়বেন তখনই কি ভাঙবে এ ঘুম? মরুভূমিও তো নেই বাঙালীর যে অন্য ইজরায়েল গড়ে তাতে বাস করবেন! আসলে, 'ইজরায়েল' গড়তে জমি লাগেনি। সেটা অবান্তর। ইহুদিদের 'চরিত্র' ছিলো বলেই আজ 'ইজরায়েল' অতটুকু দেশ হয়েও এতবড় দেশ। তার রাজনৈতিক মতাদর্শ যাইই হোক না কেন। তাদের মাতৃভাষা হিব্রু।

আমার এইই অনুরোধ যে আপনারা এবার একটু নড়ে চরে বসে চোখ মেলুন; নিছকই বেঁচে থাকার জন্যে, মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্যে। নিজেদের ছেলেমেয়েরা যখন তাদের তর্জনী আপনাদের নাকের সামনে তুলে বলবে "তোমরা কি করেছো? কি করেছিলে আমাদের জন্যে?" তখন কী জবাব দেবেন সেই কথাই একটু ভাবতে বলছি।

আমি জানি, আপনারা বলবেন, নেতা কই?

আপনাদের একটা গল্প বলি শুনুন। এই গল্প বাঙালীদের নেতা নিয়ে লেখা নয়। ভারতের নেতৃত্বর সংকট নিয়েই লেখা। গল্পটি

প্রায় বারো-তেরো বছর আগে আনন্দবাজারের পুজো বার্ষিকীতে লিখেছিলাম। নাম, 'আয়নার সামনে'।

উত্তর প্রদেশের এক জমিদার-তনয় সেই গল্পর নায়ক। সে বেচারী বাবার মতো অত্যাচারী ও বিলাসী না হয়ে তার বাবার জমিদারীর সমস্ত জমি রাশিয়ান কায়দায় "খলখোজ" যৌথ-খামারের ভিত্তিতে চাষ করতো। প্রত্যেক প্রজা এবং সে নিজেও সমান করে ভাগ করে নিতো সেই উৎপাদিত শস্য। সেই জমিদার তনয়ের নাম ছিলো রাজিন্দর। উত্তর প্রদেশের ঐ অঞ্চলে খুব ভালো আঁখ হতো। রাজিন্দর ভাবলো, ওখানে একটি চিনির কল করতে পারলে ঐ অঞ্চলের সমস্ত গরীব-গুরবো চাষীদের অবস্থা ফিরে যাবে। তাই সে এম. এল. এ. ও এম. পি.-দের ধরে ওখানে একটি চিনির কল যাতে হয় তার প্রস্তুতি হিসেবেই আগে নদীতে একটি বাঁধ দেওয়ার বন্দোবস্ত করলো। যাতে সেচের জল পাওয়া যায় উষর জমিতেও। রাজিন্দর সব কাজ ফেলে ঐ বাঁধের কাজ তদারকিতে লেগে গেলো। 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ' তাড়াবার অনর্থকরী উদ্যোগে নিয়োজিত করলো সে নিজেকে।

রাজিন্দরের বাবার একটি জলসাঘর ছিলো। বিরাট হলঘর। দেওয়াল-জোড়া আয়না মোড়া সীস্‌মেহাল। তার বাবা তাতে বাঈজী আর তওয়াএফ্‌দের নিয়ে ম্যায়ফিল্‌ করতেন। নৃত্য গীতরতা নগ্ন নারীদের হাজার হাজার কম্পিত প্রতিবিম্ব দেখে মুগ্ধ হতেন। রাজিন্দর সেই সীস্‌মেহালে চারটি কালো রাগী অ্যাল্‌সেসিয়ান কুকুর পুষেছিলো। সেই চার কুকুরের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এক সাদা-দাড়ি, সাদা-চুলের বৃদ্ধ। সেই বৃদ্ধর নাম ছিলো 'ইজ্জৎ'। কুকুরগুলির নাম রেখেছিলো রাজিন্দর যথাক্রমেঃ মালিক, নোকর, আমীর আর গরীব। ঐ চারটি কুকুরকে নিয়ে রাজিন্দর আসলে এক পরীক্ষা চালাচ্ছিলো কখনও গরীবকে না খাইয়ে রেখে, কখনও আমীরকে অথবা কখনও মালিককে বেশি খেতে দিয়ে; নোকরকে অভুক্ত রেখে। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সে দেখতে চেয়েছিলো কুকুরদের আভ্যন্তরীণ

সম্পর্কর ও ব্যবহারের উপর পরীক্ষার প্রভাব কিরকম হয়। ঐ চারটি কুকুরের মধ্যে কেউ বাঘের মতো ব্যবহার করে কিনা তাই-ই আবিষ্কার করতে চেয়েছিলো সে। কুকুরদের মধ্যে থেকে বাঘের গুণের কোনো নেতা তৈরী আদৌ হয় কি হয় না তাইই দেখতে চেয়েছিলো।

এদিকে বাঁধের নির্মাণ কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে একদিন হঠাৎ বিকট শব্দ করে সেই বাঁধ ভেঙ্গে পড়লো। এদেশের কেন্দ্র ও রাজ্যর সরকারী প্রকল্পর নানা বাঁধই যেমন করে ভেঙ্গে পড়ে। যেমন করে উঠে যায় মাত্র সাত দিনেই, নতুন-বানানো রাস্তার পিচ। বা কংক্রীট। ভেঙ্গে পড়ে সরকারী বাড়ি, তেমনই করে। রাগে সে উন্মত্ত হয়ে বাঁধের ঠিকাদারকে বন্দুক হাতে গুলি করে মারতে গেলো। ঠিকাদার তাকে বললো: "আমি তো বানিয়াই। পয়সা বানাবার জন্যেই আমি ঠিকাদারী করি। সিমেন্টে আমি কাদা মিশিয়েছিলাম। স্বীকার করছি। কিন্তু কেন তা মিশিয়েছিলাম? অনেক এম. এল. এ. ও এম. পি-কে পয়সা দিতে হয়েছিলো আমার। অনেক সরকারী এঞ্জিনীয়ার, সুপারভাইজারদের। তাদের লিস্ট আমি তোমাকে দিচ্ছি। এদের সকলকে মেরেই তারপর তুমি আমাকে মারতে এসো। আমি তখন তোমার গুলি খেয়ে মরতে রাজী আছি। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবো তখন। প্রতিবাদ করবো না। কোরো গুলি।"

শর্ষের মধ্যেই যে ভূত ঢুকে গেছে। এই দুর্নীতির ভূতকে তাড়াবে কোন্ ওঝা?

সে রাতেই ব্যর্থ, হতাশ, আশাভঙ্গ, এই দেশ এবং দেশের মানুষকে বড় ভালোবেসেছিলো যে-যুবক সেই রাজিন্দর নিজের বাবার সীস্‌মেহালের চারটি কুকুরকে আগে গুলি করে মারলো। তারপর নিজেকেও।

এই রকম অনেকেই রাজিন্দর আজকে সারা ভারতবর্ষে আত্মহত্যা করছে। কিন্তু বন্দুক দিয়ে করছে না বলে তাদের মৃত্যু শব্দহীন। অন্যায়, দুর্নীতি, অবিচার, ভণ্ডামি সবকিছুরই প্রতিবাদের নানা রকম আছে। রকম হয়। কেউ অন্যকে গুলি করে। কেউ নিজেকে। আবার

একটু একটু করে অলক্ষ্যে মরে-যাওয়া টিকটিকির মতো মানুষদের খোঁজ আমরা রাখি না   তাইই জানি না তাদের সংখ্যা কী অগণ্য!

কলকাতার একটি বাঙালী ছেলের মুখ দিয়েই গল্পটি বলা হয়েছে। সে চাকরী করতে গেছিলো উত্তরপ্রদেশের ঐ অঞ্চলে তার পিসেমশাই-এর রেফারেন্সে এবং তার সঙ্গে রাজিন্দরের এক ধরনের "দোস্তীও" তৈরী হয়েছিলো।

"আয়নার সামনের" শেষ কটি পংক্তি এই রকম :

"দারোগার সঙ্গেই ঢুকলাম আমি। ঢুকেই দেখলাম রাজিন্দরের চারপাশে সেই কালো কুচকুচে চারটে কুকুরও মরে পড়ে আছে। প্রত্যেকেরই ফুসফুসের মধ্যে দিয়ে গুলি চলে গেছে। আমীর এবং মালিক, গরীব এবং নোকর চারজনই পাশাপাশি শুয়ে আছে। চারজনই রাজিন্দরের শব পাহারা দিচ্ছে। আয়নাগুলোর দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম আমি। কুঁকড়ে গেলাম নিজের চেহারা দেখে। তারপর ভালো করে তাকাতেই দেখি, আলো-চম্‌কানো আয়নার উপরে আলকাতরা দিয়ে আঙুল বুলিয়ে কী যেন লিখেছে রাজিন্দর। হিন্দীতে। বড় বড় করে লিখেছে।

বিরাট ভুঁড়িওয়ালা বড় দারোগা পা-ফাঁক করে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে, প্রায় অশিক্ষিতর মতোই বানান করে পড়ছিলো : "বাঘের বাচ্চা কোনোদিনও কুকুরের বাচ্চাদের নেতা হয় না। কুকুরদের নেতা কুকুররাই হয়। সব সময়"।

দারোগা একটু চুপ করে থাকলো। তারপর স্বগতোক্তি করলো 'দিমাগ্ খরাব্ হো গ্যায়া থা।"

রাজিন্দর কপালে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে ট্রিগারটা টেনে দিয়েছিলো। সুন্দর মুখময় খয়েরী খয়েরী কী সব থক্‌থকে জিনিস মাখামাখি হয়েছিলো। এই সুন্দর উপত্যকার, এই গুঁলিস্তার বুলবুলির ঠোঁট দিয়ে রক্ত গড়িয়ে গেছিলো ; যে ঠোঁট আর কখনও গান গাইবে না।

কিছুক্ষণ পর সীস্‌মেহাল থেকে ধীরে ধীরে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দেখি, সেই থম্‌থমে রাতে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, জড়ো হচ্ছে

সীস্‌মেহালের কাছে। এখানে, ওখানে, আশে-পাশের টিলায়-জঙ্গলে, ক্ষেতে, কাছে-দূরে অন্ধকারে বিন্দু বিন্দু আলো কাঁপছে। কুপী, বা মশাল বা হ্যারিকেনের আলো। ওরা চতুর্দিক থেকে রাজিন্দর সিং চৌহান সাহেবের বাড়ির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ঐখানে দাঁড়িয়ে আমার হঠাৎই মনে হলো, আমার চারদিকে, কাছে দূরে অনেকগুলো বাঘেরই চোখ যেন অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে!

তারাভরা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, হঠাৎ একেবারে হঠাৎই কী যেন এক শ্বাসরোধকারী যন্ত্রণায় আমার বুক ভেঙ্গে যেতে লাগলো। এই আমি, এই পাত-কুড়োনো পিসেমশাই-সর্বস্ব চড়ুই পাখি আমি, সেই অন্ধকারে হু হু করে কেঁদে উঠলাম।

কবে? রাজিন্দর কবে? তোমার এই স্বপ্ন সত্যি হবে? কবে আমরা এই আসমুদ্র হিমাচলের কোটি কোটি মানুষ বাঘের মতো মাথা উঁচু করে, আত্মসম্মানের গর্দান ফুলিয়ে তোমার এই সীস্‌মেহালের আয়নার সামনে দাঁড়াবো?

কবে? রাজিন্দর কবে"?

এই 'আয়নার সামনে' লিখেছিলাম পনেরো বছর আগে। এবং আনন্দবাজারেই যে, তা আগেই বলেছি। যাঁরা আনন্দবাজার গোষ্ঠীকে লেখকের স্বাধীনতা হরণের দোষে দুষ্ট করেন, "অপসংস্কৃতির" প্রচারক বলেন তাঁরা যে সত্যি কথা বলেন না তা আপনারাই বুঝবেন। কোনো লেখক বা সম্পাদকের উপরে আমার জ্ঞাতসারে আনন্দবাজার কখনওই নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা আরোপ করেনি, যদি না কেউ সরাসরি তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ না করেছেন। আমি আনন্দবাজারে চাকরী না করেই এ কথা জোরের সঙ্গে বলব। এটা লেখকদেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাঁরা কি লিখবেন বা না লিখবেন। সে জন্যে ঐ গোষ্ঠীকে দোষারোপ করার কোনো যুক্তি নেই।

এমার্জেন্সীর সময়ে আনন্দবাজারের বরুণ সেনগুপ্ত (এখন "বর্তমান" দৈনিক কাগজের সম্পাদক) এবং গৌরকিশোর ঘোষ (মাঝে কিছুদিন 'আজকাল' দৈনিকের সম্পাদক ছিলেন, এখন আনন্দবাজারে ফিরে

এসেছেন) জেলে গেছিলেন। যা অনেকেই জানেন না, তা হচ্ছে এইই যে, তখন একটি সাপ্তাহিকীতে ইয়ারোপের উপরে লেখা আমার ভ্রমণ কাহিনী "প্রথম প্রবাস" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিলো। তাতে আমি ভারতীয় গণতন্ত্র এবং ব্রিটিশ গণতন্ত্রর রকম নিয়ে লিখেছিলাম। ভারতের গণতন্ত্র যে ফাঁকাবুলি, এমার্জেন্সী যে রাজনৈতিক হাতিয়ার তা পরোক্ষে বলেছিলাম। কিন্তু সম্পাদক ফোনে আমাকে বার বার সাবধান করছিলেন এবং প্যারাগ্রাফের পর প্যারাগ্রাফ উড়িয়ে দিয়ে সেখানে নানা নিসর্গদৃশ্য ছাপা হচ্ছিলো। অবশ্য পরে শুনেছিলাম 'কেন্দ্রের নিয়োজিত' 'সেন্সার অফিসারই' ঐ সব করছিলেন। ওঁর দোষ ছিলো না।

হঠাৎ এক সংখ্যাতে ছাপা হলো যে আমি অসুস্থ তাই 'প্রথম প্রবাস' বন্ধ থাকছে।

তারপরই আমার পৈতৃক নিবাস এবং আমার বাসস্থানে যুগপৎ রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ থেকে "রেইড" হলো অত্যন্ত বাজে ও মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে।

তাই সম্পূর্ণ মিথ্যা অজুহাতে হেনস্থা কম করেননি আমার মতো সামান্য জনকেও তৎকালীন রাজ্য সরকার। এবং হয়তো কেন্দ্রের নির্দেশেই। পরদিন ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁর দেখা না পেয়ে তাঁর অধস্তনকে বলে এসেছিলাম যে "আমি খেটে খাই রাশিয়া বা আমেরিকার টাকাতে আমার সংসার চলে না। যা করেছেন তা করেছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যেন এরকম না করেন।" পরদিন সেই ভারপ্রাপ্ত অফিসারকেও ঠিক এই কথাই ফোনে বলেছিলাম। ভদ্রলোক কোনো জবাব দেননি। হয়তো ভদ্রলোক বলেই দেননি। রাজ্য পুলিশ তো চিরদিনই রাজনৈতিক দলেদের সবচেয়ে বড় শিকার। সে কংগ্রেস দলই ক্ষমতাতে থাকুক আর অন্য দলই থাকুক।

প্রশাসন, পুলিশ, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদিকে রাজনৈতিক দলের হাত থেকে বাঁচাতে না পারলে এই গণতন্ত্র এক ভাঁড়ামিতেই পরিণত হবে।

অবশ্য তার বিশেষ বাকিও নেই।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। এমার্জেন্সী উঠে যাবার পর রাজ্য পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ অফিসার স্বীকার করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে এমার্জেন্সীর সময় যে স্বল্পকটি অন্যায় "একসেস"-এর ঘটনা ঘটেছিল তার মধ্যে আমার হেনস্থা অন্যতম।

বাংলার প্রতি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার যতখানি অবিচার করেছেন রাজ্যর কংগ্রেস সরকারও তার কিছু কম করেননি। বিধান রায়-এর কথা আলাদা।

বামফ্রন্ট সরকারকেও বাঙালী অনেক আশা করেই ভোট দিয়েছিলো। প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর তো সমস্ত দোষই আগের সরকারের বলেই চালিয়ে গেলেন ওঁরা অবলীলায়। দশ বছর পরেও কি একই যুক্তি খাটবে? এবারেও ক্ষমতাতে হয়তো ওঁরাই আসবেন। তারপর? ওঁরাই বা কী করলেন? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথ-ঘাট, চাকরী-বাকরী, খাদ্য-ভেজাল, যানবাহন কোন বাবদে ওঁরা কতটুকু করলেন এই অভাগা বাঙালীর জন্যে?

আবার, বলছি আপনার রাজনৈতিক মতাদর্শ আপনার। আপনি কংগ্রেসী না বামপন্থী সেটা আপনারই ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেই বাবদে কোনোরকম কথা বলা আদৌ আমার অভিপ্রেত নয়। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক হবেন এইই তো স্বাভাবিক। কিন্তু যদি আপনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকেন তবে শুধুমাত্র প্রার্থী দেখেই ভোট দিন এবারে। আপনার ভোটের বিকল্প যদি কোনো বোবা আর হাত-তোলা মোসাহেব গুণ্ডা আর চোরের মধ্যেই বেছে নিতে হয় তবে "পোলিং-বুথে" গিয়ে ব্যালট পেপারে আপনার হতাশা শূন্যতায় রূপান্তরিত করুন। চল্লিশ বছর ধরে এমনই সব প্রকৃতির মানুষ রাজ্য এবং কেন্দ্রের রাজনীতি করতলগত করে রেখেছেন যে তাঁদের অনেকেই রাজনীতি না করলে হয়তো মাসে হাজার টাকাও সৎপথে আয় করতে পারতেন না। তাঁদের নেতাগিরিতে, এই সার্কাসের গণতন্ত্র থেকে আপনারা আর

কি প্রত্যাশা করতে পারেন ?

আপনার দলীয় প্রার্থীকে ভোট দিলেও তাঁদের বুঝিয়ে দিন যে, প্রত্যেকটি ভোট-প্রার্থীই আপনাদেরই সেবক। দাসানুদাস। আপনাদের ভোট-কেন্দ্রের সমস্ত অভাব-অভিযোগের নিরসন করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁরই। আপনারা তাঁর সেবক আদৌ নন। প্রত্যেক নির্বাচনের আগেই এই কথাটা প্রাঞ্জল করে তাদের প্রত্যেককেই বুঝিয়ে দিন। চোখবন্ধ করে ভোট দিয়ে আরও পাঁচ বছর অযোগ্য, অসৎ, দলবদ্ধ গড্ডালিকার হাতে নিজের ও নিজের সন্তানদের ভবিষ্যৎ এমন নির্বিকারভাবে ছেড়ে দেবেন না। এই দেশের, রাজ্যর প্রধানতম শরিক আপনিই। ভোটদাতা। আপনার ভোটকে ক্ষুরধার অস্ত্রর চেয়েও শক্তিশালী করে ব্যবহার করুন। চল্লিশ বছর ধরে অনেক বক্তৃতা অনেক ভয় অনেকই গলা-কাঁপানো মিছিল, সারাদিনের কাজের পর অনেক ট্র্যাফিক-জ্যামে পড়তে হয়েছে আপনাদের। অনেকই মিথ্যে-আশ্বাস আপনাদের দেওয়া হয়েছে। এবার আপনারা সচেতন হয়ে ভোট দিন। দেশের গণতন্ত্রকে সার্থক গণতন্ত্রে রূপান্তরিত করুন। নির্দল প্রার্থীরাও অনেক বেশি সংখ্যাতে নির্বাচিত হলে তাঁকেও কাজ হবে। এই কথাটা ভুলে যাবেন না যে, সারা দেশে যত ভোটদাতা আছেন তাঁদের মধ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী বা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ অতি নগণ্য। তবে আপনার আমার মতো মানুষ, আমাদের জীবন ও ভবিষ্যৎ অল্পকটি মানুষের হাতে অন্ধের মতো সঁপে দেবোই বা কেন ? গণতন্ত্রে "পার্টি-সিস্টেম ছাড়া গতি নেই" এ কথা যাঁরা বলেন তাঁরা ঠিক নন। এই দেশে অন্ততঃ পার্টি-সিস্টেম ফলপ্রসূ হয়নি।

আপনি কত মাইনে পান ? কি করেন ? কোথায় থাকেন ? আপনার মেয়ের বিয়ে হয়েছে ? ছেলের চাকরী আছে ? আপনি কাল মারা গেলে আপনার পরিবারের কি হবে ? বৃদ্ধবয়সে অসুস্থ হলে এই গণতান্ত্রিক সরকার কি করবেন আপনার জন্যে ? এই সমস্ত কথার উত্তরই কিন্তু আপনার নিজের এবং নিজের পরিবারের

ভোটের মধ্যেই নিহিত আছে। চাকা উল্টে দিন। ভি. আই. পি. প্রার্থীদের তাদের যোগ্য জায়গাতে টেনে নামিয়ে নিজেরাই ভি আই. পি. হোন। প্রকৃত গণতন্ত্রে, শিক্ষিতদের গণতন্ত্রে, তাইই হয়। তাইই হওয়া উচিৎ। ভোটদাতারাই আসল।

এই গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যদি কখনও বিবৃতি দেন যে "আজ সূর্য পশ্চিম দিকে উঠেছে" সঙ্গে সঙ্গে সরকার পক্ষের সমস্ত সদস্য হাত তুলে বলে ওঠেনঃ হেঁ! হেঁ! ঠিক "ঠিক!" আবার যদি প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী কখনও বিবৃতি দেন যে "আজ সূর্য পূর্ব দিকে উঠেছে" অমনি প্রত্যেক বিরোধীপক্ষর সদস্যরা চেঁচিয়ে বলেন "না। না। তা হতেই পারে না।" তারপরই টেবল চাপড়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। এ গণতন্ত্র আসল গণতন্ত্র নয়।

যাদের গরু, ভেড়া, ছাগলের মতো টাকা দিয়ে সহজেই কেনা-বেচা যায় তেমন মানুষদেরই এতদিন আপনারা প্রত্যেকে নির্দ্বিধায় ভোট দিয়ে এসেছেন। তাদের ভুল করেও আর ভোট দেবেন না। দলের ভালো, যেন-তেন প্রকারেণ গদীতে আসীন থাকার সাধনাই যাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, যাঁদের দেশসেবার প্রকৃত স্বরূপ; দেশ এবং দেশের মানুষ জাহান্নমে গেলেও তাতে যাঁদের কিছুমাত্রও বিকার ঘটে না, ঘটেনি এই চল্লিশ বছরে; তাঁদেব সঙ্গে ধমক দিয়ে, চোখ রাঙিয়েই কথা বলুন এবার থেকে। সামনে দাঁড়িয়ে হাত কচলাবেন না। অনেকই দেরী হয়ে গেছে। নিজেকে, নিজেদের বাঁচান; দেশকে বাঁচান। ভয় পাবেন না। এখনও যদি ভয় পান, ভয় পেয়ে বা জবরদস্তীর বলি হয়ে ভোট দেন অথবা অনিচ্ছায়; তবে আপনার, আপনাদের সকলের মরাই উচিত। মরার বিশেষ বাকিই বা কি আছে আর?

বাঁচতে হলে কিছু যোগ্যতা লাগে। কিছু সাহস।

প্রত্যেক গণতন্ত্রর মূল কথা হচ্ছে 'অফ দ্যা পিপল, বাই দ্যা পিপল, ফর দ্যা পিপল"। এখানে কেন্দ্র বা রাজ্যে যেই দলই ক্ষমতায় আসুন না কেন তাঁরা শুধু তাঁদের দলের কথাই ভেবে গেলেন। যে সব ভোটদাতারা তাঁদের ভোট দেননি তাঁদের সবরকমভাবে ব্যতিব্যস্ত করাই

সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং বিরোধীপক্ষর একমাত্র কাজ হলো সরকার দেশের দশের জন্যে ভালো কিছু করতে গেলেও তার বিরোধীতা করা। এমন হাস্যকর ও লজ্জাকর গণতন্ত্র পৃথিবীতে খুব কম জায়গাতেই আছে। আর আমরাই গুমোরে মরি বৃহত্তম পৃথিবীর "বৃহত্তম গণতন্ত্র" বলে।

এ পর্যন্ত সব রাজনৈতিক নেতারাই তাঁদের পুঁথি-পড়া কচকচানি, তাঁদের রাশান, আমেরিকান, চাইনীজ বা ফ্রেঞ্চ "ইজম" নিয়েই এত বেশি মেতে রইলেন যে, দেশের মানুষের অবস্থার কথা ভাবার অবকাশই তাদের হলো না চল্লিশ বছরে। 'ইণ্ডিয়ানিজম্' এর কথা একজনও বললেন না। বিদেশী গাছ সব সময় দেশের জমিতে যে বাঁচে না এই কথা একবারও ভাবলেন না কেউই। যদি বা কেউ কিছু করেনও তা তাঁর নিজের কেন্দ্রেরই জন্যে। প্রমাণ, প্রফুল্ল সেনের আরামবাগ। ইন্দিরা গান্ধীর রায়-বেরিলি। গণিখান চৌধুরীর মালদা। প্রকৃত গণতন্ত্রে এমন হবে কেন? যাঁদের উপর সারা দেশের শুভাশুভর ভার তাঁরা এমন পক্ষপাতিত্ব করবেনই বা কেন? আবার অন্যভাবে দেখতে গেলে বলতে হয় তাঁরা নিজের কেন্দ্রর প্রতি অত্যন্ত সুবিচার করেছেন। যাঁরা তাদের ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের নিরাশ করেননি তাঁরা। প্রত্যেক নির্বাচিত প্রার্থীই যদি এমন করতেন তাহলে তো সারা দেশেরই উন্নতি হতে পারত! তা হয়নি এই ভুলে-ভরা 'পার্টি সীস্টেমেরই' জন্যে। পার্টির মধ্যে যাঁরা প্রধান বা যাঁদের জোর খাটাবার ক্ষমতা আছে অথবা যাঁরা যে-কোনো উপায়ে নিজের কেন্দ্রের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরাই এমন করতে পেরেছেন। পাঞ্জাবের প্রতাপ সিং কাঁয়রোর সততা সম্বন্ধে সন্দেহ অনেকেরই প্রকট ছিলো। কিন্তু ঐ মানুষটি পাঞ্জাবের জন্যে যা করে গেছিলেন তাতে তাঁর দোষের কথা, যদি সেই দোষ সত্যিও হয়ে থাকে; তা তাঁর রাজ্যের মানুষের মন থেকে মুছে গেছে।

'কোজাগর' উপন্যাসে আমি মানি ওরাওঁ এবং তার স্ত্রী মুঞ্জরীর কথা বলেছি। ওদের কথা যদি কেউ জানেন তবে জানবেন যে ওরাই আসল ভারতীয়। দিল্লীর অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় ফ্লাই-ওভারেরর চমক, এশিয়াড গেমস এর গ্রাম, হাজার হাজার মাইল কংক্রিটের রাস্তা, জনমানবহীন

বহুশত মাইল পথে মার্কারী ভেপার ল্যাম্পের আলোকমালার ঔজ্জ্বল্যে ওদের অবস্থার বিন্দুমাত্র হেরফের হয়নি।

কোজাগর-এর নানকু ওরাওঁ সেই যুবক, যে অন্য কথা বলতো, যার বুকে ভয় বলে কোনো কথা ছিলো না। সে মাঝে মাঝে হঠাৎ ভালুমারএ উদয় হয়ে ওদের নাড়া দিয়ে যেতো। মিথ্যা—খুনের মামলা ঝোলানো ছিলো ওর মাথায়। যেমন মামলা এই মহান গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যেই লক্ষ লক্ষ সাধারণ অসহায় মানুষের মাথায় আজও ঝুলছে। এই দেশের অগণ্য জেলে জেলে পচে মরছে আজও বিচারাধীন নির্দোষ আসামীরা। বিনা চিকিৎসায়, বিনা খাদ্যে, বিনা বিচারে শেষ হয়ে যাচ্ছে অমূল্য সব জীবন। লক্ষ লক্ষ মেয়ে, হরিজন মানুষ আজও ধর্ষিত ও নিহত হচ্ছে। কতরকমের জাত-পাতের রকম আজও রয়েছে এখানে। 'বিন্যাস' উপন্যাসে, (আনন্দবাজারের পূজো সংখ্যায় প্রকাশিত এবং আনন্দ পাবলিশার্স-এর বই) আমি এই তথাকথিত "ক্লাসলেস সোসাইটি"র বুলি যে কতখানি মিথ্যা তাইই দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম। মানুষে মানুষে এত ভেদ পৃথিবীর কোনো চরম ক্যাপিটালিস্ট অথবা কম্যুনিস্ট দেশেও নেই।

'দু-নম্বর' উপন্যাসে, স্বাধীনতার পর দু নম্বর টাকা, দু নম্বর মানুষ, দু নম্বর নেতা, দু নম্বর ওষুধ, দু নম্বর মোটর গাড়ির পার্টস, এবং সমস্ত দেশটাই যে-দু নম্বরী হয়ে উঠেছে তা নিয়েই লিখেছিলাম। এই বইও আনন্দ পাবলিশার্স ছেপেছেন। কিন্তু ক্রিয়েটিভ লেখা-লেখি পড়ার মতো বেশি রাজনৈতিক নেতা এবং পাঠক তো নেই। রাজনীতিই এখন সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। যা বলতে চেয়েছি তা রাজনীতি-মনস্ক বাঙালীদের কাছেও আজ পৌঁছনো দরকার।

অনেক ভেবেই তাই যা বলার সোজাসুজি বলতে বসেছি। 'ভাবার সময়'কে সাহিত্য কেউ বলবেন না। আমিও না। কিন্তু ভাবার সময়ে ভাবতে না বলেই বা কি করি? বাঙালী জাত হিসেবে আমরা নির্বুদ্ধিই যদি হয়ে যাই তবে সাহিত্য পড়বে কে? আর এই

দেশেরই শহরে নিজের নিজের ছোট্ট ছোট্ট সুখে ভরপুর আমরা রঙীন টিভির সামনে বসে দেখছি দেশের প্রধানমন্ত্রী আফ্রিকা ফাণ্ডে কোটি কোটি টাকা দান করছেন। পৃথিবীর বর্ণ বৈষম্য সম্বন্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় খাঁটি "অক্সোনিয়ান" ইংরিজিতে বক্তৃতা দিচ্ছেন। হিন্দী ও ইংরিজি খবরের পুরো সময়ের মধ্যে ওঁকে আধঘন্টা তো দেখতে হয়ই। প্রতিরাতে আধঘন্টা ধরে আমি স্মিতা পাতিল বা রেখা বা অপর্ণা সেনের মুখও দেখতে রাজী নই। টিভিতে যেসব 'অ্যাডস্' দেখি আমরা আর সেই সব অ্যাডসের মডেলদের জীবনযাত্রা, বাড়ির আসবাব, সাজ পোশাক, ভাব-ভঙ্গী এবং যেসব ভোগ্যপণ্যর বিজ্ঞাপন আমরা দেখি সেই সবের একটিও কেনার সামর্থ এই দেশের নিরানব্বুই ভাগ মানুষেরই নেই। সমানে চলেছে এই ডাবল-স্ট্যাণ্ডার্ড। প্রতিবাদ কে করবে?

জওহরলাল নেহরু থেকে রাজীব কেউই তো প্রকৃত ভারতীয় ভাবধারা ও জীবনযাত্রায় সম্পৃক্ত নন। দেশের কতটুকু দেখেছেন এঁরা? যদি বা কোথাও তাঁরা যান তার একমাস আগে নতুন পথ তৈরী হয়ে যায় তাঁদের জন্যে। হেলিপ্যাড বানানো হয়। বুলেট প্রুফ গাড়ি আর বাক্স উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজীব গান্ধীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে দিনে দেড় কোটি টাকা খরচ হয়। সার্কিট হাউসে বা যেখানে প্রাতঃরাশ অথবা লাঞ্চ খাবেন তাঁরা একবেলা সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যায়। একেই তো বলে জনগণের নেতা! এই চল্লিশ বছরে লালবাহাদুর শাস্ত্রীই ছিলেন একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি ছিলেন পুরোপুরী ভারতীয়। 'গ্রাসরুট-লেভেল' থেকে যিনি এসেছিলেন। তাসখন্দ-এ তাঁর হঠাৎ মৃত্যুর রহস্যও নেতাজীর অন্তর্ধানের রহস্যর মতো, কাশ্মীরের জেলে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যুর রহস্যরই মতো এখনও পরিষ্কার হলো না। খুব কম গণতন্ত্রেই এমন ঘটনা ঘটা উচিত।

"কোজাগরের" নানকু ওরাওঁ এর কথাতে ফিরে আসি।

"কিন্তু নানকুর দেখা চাইলেই তো পাওয়া যায় না। এই তানুমানের [illegible] মানুষগুলো, বাবা কাকা-[illegible]

মুখ চেয়ে হাতি বাইসন থেকে খরগোস পাখি পর্যন্ত তাবৎ জংলী জানোয়ার ও পাখির করুণা ভিক্ষা করে কোনোক্রমে বেঁচে থাকে শীত থেকে বসন্ত, বসন্ত থেকে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্ম থেকে বর্ষা, বর্ষা থেকে শরৎ, শরৎ থেকে হেমন্ত এবং হেমন্ত থেকে শীতে—তাদের কাছে নানকু এক দৈববাণী বিশেষ। মাঝে মাঝেই উদয় হয়ে কোন্ অজানা অচেনা অচিন দেশের কথা বলে যায় নানকু ওদের। যে-দেশ এর অস্তিত্ব কোথায় তা ওরা জানে না। কিন্তু নানক বলে, একদিন তেমন কোনো দেশ নতুন করে জন্মাবে পুরোনো অভ্যেসের ধুলিমলিন এই দেশেরই মধ্যে। যেখানে, ওরাও সুযোগ পাবে সমান। দুবেলা দুমুঠো খেতে পাবে। লজ্জা ঢাকার শাড়ি পাবে। মাথা উঁচু করে পরিশ্রমের বিনিময়ে মানুষের মতো বাঁচতে পারবে। সেই সোনার খনি কোথায় আছে? কোন্ অজগরের মাথার মণিতে? সেই খনির হদিস বুঝি কেবল নানকুই জানে।

নানকু বলতো, ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ি সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতো। ওর সব কথাই সকলে বুঝতো এমনও নয়, কিন্তু তাদের বুকের রক্তের মধ্যে ছলাৎ ছলাৎ দোলা অনুভব করতো প্রত্যেকে। নানকু বলতো, বুঝলে, এই দেশে ধন-রত্নের কোনো অভাব নেই। হাজার হাজার বর্গ মাইল চাষের জমি, আবাদী ও অনাবাদী; টাঁড়, বেহড়, নদী-নালা, পাহাড় পর্বত। এবং কোটি কোটি লোক। কিন্তু যা নেই, যে জিনিসের দরকার তা; কেবলমাত্র একটি মাত্রই। অভাব শুধু মানুষের মতো মানুষের।

যারা ভাগ্যে বিশ্বাস করে, রাজনৈতিক নেতাদের বুজরুকিতে বিশ্বাস করে, সমতার বুলির মিথ্যা ভাঁওতায় বিশ্বাস করে গত তিরিশ বছর শুধু ঠকেই এসেছে, তাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন শুধু ঐ একটাই জিনিসের। মানুষের মতো মানুষের, নেতার মতো নেতার। যে নেতারা বাধ্যতা-মূলকভাবে জনগণের ঘাড়ে সম্মান বা ভালোবাসা ছাড়াই চেপে বসে তেমন নেতা নয়। যারা এই জঙ্গলের টাঁড়ের গর্তের ডিম-ফুটে বেরুনো মহা বিষধর সাপেরই মতো, জঙ্গলের পাথরের নিচে জন্মানো পোকার মতো, বিছের মতো, পাহাড়ের গুহাতে পায়দা হওয়া বাঘের বাচ্চার মতো, যারা এখানেরই, এই দেশেরই, তেমন নেতার। যাদের শিকড়

প্রোথিত আছে গহন গভীরে, গ্রামে-গঞ্জে, জঙ্গলে পাহাড়ে, যারা সৎ, যারা লোভী নয়, যারা দেশের মানুষকে ভালোবাসে, দেশকে ভালোবাসে, কোনো দলমত অথবা পুঁথিপড়া ডান বা বাম কেরদানির চেয়ে অনেক বেশি করে। তেমন নেতাদেরই দরকার আজকে। যারা দেশজ নেতা। দশের নেতা।"

কোজাগরে আরও লিখেছিলাম:

"তিনি শুধু আমার মালিকই নন, তিনি এই হতভাগা দেশের বেশিরভাগ মালিকেরই প্রতিভূ। এঁদের জন্যেই চিরদিনের অন্ধকার এখানে। শলা-পরামর্শ করে এঁরাই চিরদিন গরীবদের, কর্মচারীদের পায়ে শিকল পরিয়ে রেখেছেন; যাতে তারা নড়তে চড়তে না পারে, যাতে তারা উঠে না-দাঁড়াতে পারে, যাতে বুক ফুলিয়ে টানটান হয়ে শ্রমের সম্মানী না চাইতে পারে। যা এঁরা মানুষের মতো হয়ে অন্য মানুষকে মর্যাদার সঙ্গে দিতে পারতেন ভালোবাসায়; নিজেদেরও অশেষ সম্মানিত করে, সেইটুকুই তাদের কলার-চেপে না ধরলে, মাথায় ডাণ্ডা না-মারলে মুখে থুথু না দিলে তাঁরা দেন না। আরও টাকা, আরও ক্ষমতা, আরও আরও সব কিছুকে শুধুমাত্র নিজেদেরই কুক্ষিগত করে রাখতে চেয়ে এসেছেন এই মুষ্টিমেয় মানুষেরা চিরটাকালই।

ভগবান এঁদের চোখ দিয়েও দেননি। এঁদেরই আনুকূল্যে টাকা দিয়ে ছুলোয়া করে ভোট শিকার করে গদীতে আসীন হচ্ছে পাঁচ বছর পরপর একদল লোক। ভালোবাসায় নয়, দরদে নয়, কোনো গভীর বিশ্বাসে ভর করে নয়, শুধু ভোট রঙ্গর ছেনালী করে বছরের পর বছর ভণ্ড, খল, ধূর্ত, বিবেকরহিত কতগুলো মানুষ এই দেশকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভাগ্যকে খুন করেছে গলা টিপে। এমনই সব কৃতী লোক, যাদের মধ্যে অনেকই এদেশে রাজনীতি না করলে আমার মতো মাসে তিনশ টাকাও রোজগার করতে পারত না, না—খেয়েই মরত।"

'কোজাগর'-এর শেষাংশে, লিখেছিলাম কটি কথা। কঃ জাগরঃ। কোজাগর। কে জাগে? কোজাগরী পূর্ণিমার সুন্দর রাতের সঙ্গে

কোজাগর এর সম্পর্ক থাকলেও এই জাগা বড় বিভীষিকার জাগা।

মানী মুঞ্জরী এবং পাহাড় জঙ্গল ঘেরা ছোট্ট গ্রাম ভালুমারের অসংখ্য দুঃখী মানুষদের কথাই বলছে এখানে বাঙালী সায়নবাবু যাকে স্থানীয় লোকেরা ডাকতো 'বাঁশবাবু' বলে। মানি আর মুঞ্জরীর বারো আর দশ বছরের মেয়ে আর ছেলে বুলকি আর পরেশনাথ একই দিনে বর্ষাকালে বনবিভাগের খোঁড়া একটি গাড্‌হাতে সাঁতার কাটতে গিয়ে মারা যায়। সেই রাতেই বাঁশবাবু একা জেগে বসে ভাবছিলো :

"মানুষ যদি নিজের মাথা নিজে উঁচু না করে, সম্মানিত না করে নিজেকে ; তবে অন্য কেউই তাকে উন্নতমস্তক, সম্মানিত করতে পারে না। যার যার মুক্তি—তার তার বুকের মধ্যেই বয়ে নিয়ে বেড়ায় মানুষ। সেই প্রচণ্ড শক্তিকে সে নিজে যতদিন না মুক্ত করছে, ততদিন কারোই সাধ্য নেই তাকে মুক্ত করে। সম্মানেরই মতো, মুক্তিও ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না।

বুলকি আর পরেশনাথের জন্যে এই ভালুমারের আমাদের সকলের চোখের জল, সব সমবেদনা, সমস্ত ঔদার্য যে পরম মিথ্যা তা প্রমাণ করে মানি ও মুঞ্জরী আবারও চরম দারিদ্রের মধ্যে খিদেয় ধুঁকতে ধুঁকতে অশক্ত শরীরে নিজেদের ধিক্কার দিতে দিতে, নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করতে করতে বুনো শুয়োর আর শজারুদের সঙ্গে কান্দা-গেঁঠি খুঁড়ে খাবে। আবারও মাতাল হয়ে, অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে মানি বাড়ি ফিরবে হাট থেকে ; যে বাড়িতে 'বাবা' বলে তাকে আর কেউই ডাকবে না কোনোদিন। মানুষের জীবনে বোধহয় অনেকই ধরে। অনেক আঁটে। আনন্দ, দুঃখ, উৎসব, শোক, মহত্ত্ব, নীচতা সব ; সব। এই সমস্ত কিছু নিয়েই ভরে তুলে আবারও ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে দিতেই তো আমাদের মতো নগণ্য সাধারণ সব মানুষদের বেঁচে থাকা। আমাদের কাছে এর নামই জীবন। শুধুই প্রশ্বাস নেওয়া আর নিঃশ্বাস ফেলা। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সুখ দুঃখের উপরে আমরা তো কোনোদিনও উঠতে পারি না। আর পারি না বলেই হতাশ নিশ্চেষ্টতায় এই দুঃখময় রাতেও আমরা ঘুমোই, ঠাণ্ডা রক্তের সরীসৃপের

মতো। পরম আশ্লেষে। কুণ্ডলী পাকিয়ে।

জাগে না কেউই। এ দুঃখরাতে, এ দেশে ; এ যুগে।

নাকি ? কেউ জাগে ?

কে জাগে ?"

"জঙ্গলের জার্নাল" লিখেছিলাম, যে বছর আনন্দবাজার গোষ্ঠী সিনেমা পত্রিকা "আনন্দলোক"-এর প্রথম পুজো সংখ্যা বের করলেন সে বছরে। বছরটা ঠিক মনে নেই, সম্ভবতঃ উনিশশো চুয়াত্তরই হবে।

'জঙ্গলের জার্নাল' ওড়িশা রাজ্যের, অংগুল ফরেস্ট ডিভিশানের মহানদীর অববাহিকার গভীর জঙ্গল-পাহাড়ের অধিবাসীদের জীবন নিয়ে লেখা। "লবঙ্গীর জঙ্গলে"ও ওড়িশার ঐ সব অঞ্চল নিয়েই লেখা। "পারিধী" একটি খন্দ্-উপজাতীয় শব্দ। মানে, মৃগয়া। দশপাল্লা করদ রাজ্যের টাকৃরা গ্রামের থেকে পথ বেরিয়ে গেছে মেঘে-মেশা পাহাড় শ্রেণীতে। তারই উপরে বিড়িগর। খন্দ্দের এক বস্তী। সেখানে গিয়ে, থেকে ; তাদের জীবন নিয়ে লিখেছিলাম 'পারিধী'। আমার প্রায় সব উপন্যাসেরই পটভূমি তো বাস্তবই। ঘটনারও অনেকখানিই সত্যি।

"জঙ্গলের জার্নালে" নানা মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলাম। চল্লিশ বছর স্বাধীন-হওয়া দেশের নাগরিক হিসেবে আপনারা এসব জেনেশুনে হয়তো আঁৎকেই উঠবেন। কিন্তু বাস্তবের চেয়ে বড় শক-থেরাপি আর কিছুই নেই।

শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, সমস্ত পূর্বাঞ্চলই 'যে কেন্দ্রর কাছ থেকে কীরকম বৈমাত্রেয় ব্যবহার পেয়ে এসেছে এতো বছর এবং এই সব রাজ্যের প্রতিনিধিরা যে দিল্লীর নবাবদের কাছে বশংবদ হবার জন্যে শুধুই তালি-বাজিয়ে আর মোসাহেবি করে এসেছেন তারই ফল এসব। সাম্প্রতিক অতীতে আসাম প্রমাণ করেছেন যে রাজ্যর ভালোর জন্যে তাঁরা একজোট হয়ে আন্দোলনে নামতে পারেন। যদিও তাতে, বাঙালীদের ক্ষতি হয়েছে খুবই। পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্য সমানভাবে উপেক্ষিত হলেও পশ্চিমবঙ্গর রক্তক্ষয়ী, নাভিশ্বাস-ওঠা উদ্বাস্তু সমস্যা তাঁদের ছিলো না। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গর বড় বড় শহরের জীবনও

বাঙালীদের কাছে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে তার মূল কারণ অন্য রাজ্য থেকে টাকা রোজগারের জন্যে আসা কোটি কোটি মানুষের ভীড়। পশ্চিমবঙ্গ কাউকেই ফেরায়নি। কখনও প্রাদেশিকতা দেখায়নি কাউকেই। তাই সবাই জেনে গেছে এরা মূক নির্বাক প্রজাতি। এতো কষ্ট বিনাবাক্যে সহ্য করার ক্ষমতা পৃথিবীর খুব কম শিক্ষিত মানুষই রাখে।

তাইই মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে এই শিক্ষার রকমটা নিয়ে। জঙ্গলের জার্নালের কথাতেই ফিরে আসি। শূয়োর মারার জন্যে রাতে মহানদীর অববাহিকার এক গ্রামে মাচাতে বসে আছি একটি তৈলার পাশে। জঙ্গলের মধ্যে আবাদ করা ক্ষেত ও খামারকে ওড়িয়াতে বলে 'তৈলা'। সঙ্গে একজন স্থানীয় সঙ্গী।

"আমরা আজ ঝুপরীতে পাহারায় বসেছি বলে তৈলার লোকেরা আরামে ঘুমোচ্ছিল। নইলে সারারাত জেগে ওরা তাল-পট্‌কা ফাটায়। মুহুরীদের ঘর থেকে ফিতে-কমানো লণ্ঠনের আলো মাটির দেওয়ালের ফাঁক-ফোঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। এই শীতার্ত জঙ্গলের রাতে কাছে পিঠে যে মানুষ আছে, শোওয়ার মতো একটা ঘর আছে, তাতে মালসাতে আগুন আছে, এ কথা জেনেও ভালো লাগে খুব।

কিছুক্ষণ পর একদল বাইসন এলো নালার দিক থেকে। তাদের ভারী শরীরে চলাফেরার শব্দ পাওয়া গেল নালার পাথরে পাথরে। তারপর তারা বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু ভিতরে ঢুকলো না। নাক দিয়ে ফোঁ-ফাঁ করে আওয়াজ করতে লাগলো। একটা মাদী বাইসন বোঁয়াও করে ডেকে উঠলো একবার। তারপরই সদলবলে ওরা তৈলার পিছনের জঙ্গলে ঢুকে গেলো।

ফরেস্ট অফিসের কাছেই কয়েক ঘরের একটা বস্তি ছিলো। সে বস্তি থেকে একটা শোরগোল উঠলো। নারী ও পুরুষকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল। শ্যামলবাবু বাঁ কানে হাত চেপে ডান কান ওদিকে ঘুরিয়ে শোরগোলের মর্মোদ্ধার করলেন।

বললেন, একটা মাগী এখুনি বিয়োলো।

তারপর বললেন, শালার পোড়া দেশে মিনিটে মিনিটে বাচ্চা পয়দা

হয়। শুয়োরদেরও হার মানালাম আমরা! অন্য কাজ পারি আর না পারি, আমরা সবাই এই একটি কাজে খুব দড়।

ওঁর কথা বলার ধরনে আমার হাসি পেয়ে গেলো। জঙ্গলে জঙ্গলে থেকে ভাষাটাও একেবারে চাঁচাছোলা হয়ে যায়। কোনো রাখা-ঢাকার প্রয়োজন নেই। আমরা যাকে 'ম্যানারস্' বলি তা এখানে অনেকদিন আগেই তামাদি হয়ে গেছে।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। শুয়োরদের এখনও পাত্তা নেই কোনো। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক। বৃষ্টিভেজা জঙ্গলে হাওয়াটা খস্‌খস্ আওয়াজ তুলে দমকে দমকে বয়ে যাচ্ছে। হিস্-হিস্ ফিস্-ফিস্ উঠছে অস্ফুট কথার মতো। একটা একলা টিটি পাখি ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে ডাকছে পিছনের বৃষ্টিভেজা জঙ্গলে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ঐ বস্তিটা থেকে আবার একটি একলা মেয়ে-গলার তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এলো। পরক্ষণেই সেই চিৎকারটা কান্না হয়ে গলে পড়লো। তারপর গড়িয়ে গেলো ভেজা বনে বনে।

কয়েকটি লোক একসঙ্গে স্বপ্নের মধ্যে কথা বলার মতো অসংলগ্ন কথা বলে উঠলো। তারপর সেই মেয়েটির কান্নাটা ঝিঁঝিঁর শব্দের সঙ্গে, হাওয়ার শব্দের সঙ্গে, রাতের বনের ব্যাক-গ্রাউণ্ড মিউজিকের শব্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলো। তাকে আর মানুষীর কান্না বলে আলাদা করে চেনা গেলো না।

শ্যামলবাবু তখনও বাঁ কানে হাত চেপে ডান কান শিয়ালের মতো খাড়া করে বসেছিলেন। একটু পর কান থেকে হাত সরিয়ে বললেন, শুনলেন?

বললাম, আমি বুঝতে পারিনি। অত ভালো ওড়িয়া জানি না আমি যে, দূরের বিলাপের মানেও বুঝব।

তারপর বললাম, কি হলো? বলাৎকার-টলাৎকার নাকি?

শ্যামলবাবু বললেন, আরে না। বল থাকলে তবে না বলাৎকার করবে! লোকগুলোকে দেখেন না? আফিং এর গুঁড়ো খেয়ে খেয়ে কেমন বেঁকে গেছে।

আবার শুধোলাম, তাহলে চিৎকারটা কিসের ?

ঐ মাগীরই চিৎকার ? ও কিছু না।

আহা! চিৎকারটা কিসের জন্যে তাই বলুন না।

শ্যামলবাবুর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো অন্ধকারে। বললেন, সত্যিই শুনবেন ? শোনবার মতো কলজে আছে তো আপনার ?

বললাম, কী হেঁয়ালি করছেন ? বলুনই না ?

উনি বললেন, যে মাগী বিয়োলো একটু আগে, তার বাচ্চাটার নরম তুলতুলে মাথাটা একটা বড়ো ছুঁচো এসে এক্ষুনি খেয়ে গেলো। মানে, ঘিলু-টিলু সব। বাচ্চাটা বেঁচে গেলো। এই বিরাট গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হতে হলো না শালাকে। ও শালা জানতেও পেলো না যে, কত বড় বাঁচা বেঁচে গেলো এ জন্মে।

আমি চুপ করে রইলাম। গলা শুকিয়ে এলো। বুকের মধ্যে কিরকম করতে লাগলো যেন আমার।

শ্যামলবাবু বললেন, মন খারাপ হলো না কি ? মন খারাপের কি ? আমাদের মেয়েরা তো সব সুজলা-সুফলা। দশমাস দশদিন পর দেখবেন ও আবার বিয়োবে। সেই পুতের মাথা ছুঁচোয় নাও খেতে পারে। অতো হতাশ হবার কি আছে ?

ব্যাপারটার অভাবনীয়তা আর অবিশ্বাস্যতা আমাকে এমন আচ্ছন্ন স্তম্ভিত করে ফেললো যে, তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। অনেকক্ষণ আমি স্থাণুর মতো বসেরইলাম। শীত আমাকে ছেড়ে চলে গেলো। ভীষণ একটা গরম, একটা অসহায় উপায়হীন ক্রোধ আমাকে ঘামিয়ে তুললো। ক্রোধটা কার উপরে, তা বুঝতে পারলাম না।

শেষ রাতো শুয়োর এলো। হোঁৎকা-হোঁৎকা, কচু-খেকো, ঘেঁচু-খেকো, গু-খেকো শুয়োর। একদল। ধাড়ি, মাদী, বাচ্চাকাচ্চা সমেত। খচর্-খচর্, খচর্-খচর্—ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ করে তারা তৈলায় ঢুকলো। যা কিছুই বড় প্রত্যাশার সঙ্গে, বড় কষ্ট করে, বড় পরিশ্রম ও যত্ন দিয়ে গড়া তার সবকিছুই তছ্‌নছ্‌ করবে বলে।

শ্যামলবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, মারুন! মারুন!

একটা হারামীও যেন না পালাতে পারে।

রাইফেল তুলে আমি পর পর গুলি করে যেতে লাগলাম। গুলি করি, আর বোল্ট খুলি, গরম ফাঁকা খোলটা ছিটকে বেরিয়ে যায়; আবার বোল্ট চেপে নিয়েই গুলি করি। পাঁচটা গুলি চোখের নিমেষে শেষ হয়ে গেলো।

মুখ নিচু করে যখন আবার গুলি ভরছি ততক্ষণে শুয়োরের দল তৈলার বেড়া পেরিয়ে চলে গেছে।

মুখ তুলে দেখি, চারটে ধাড়ী শুয়োর পড়ে রয়েছে। বাদবাকি একটা গুলি হয় মিস্ করেছি, নয় শুয়োর আহত হয়ে পালিয়ে গেছে। রাইফেলের মার। গুলি যদি লেগে থাকে, মোটামুটি ভালো জায়গায়, তবে পাওয়া যাবে এদিকে ওদিকে।

শ্যামলবাবু উত্তেজনায় ঝুপরী থেকে লাফিয়ে নামলেন। শুয়োর-গুলোর দিকে দৌড়ে গেলেন।

বললাম, কাছে যাবেন না। বেঁচে থাকলে আপনাকে একেবারে চিরে দেবে।

শ্যামলবাবু কথা শুনলেন না। পড়ে থাকা শুয়োরদের কাছে গিয়ে তাঁর রোগা-রোগা লুঙি-পরা পায়ে লাথি মারতে লাগলেন।

তাড়াতাড়ি রাইফেল রি-লোড করে আমি যখন ঝুপরী থেকে নেমেছি ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। একটা বড় দাঁতাল শুয়োর, বুকে গুলি লাগা সত্ত্বেও; শ্যামলবাবু তার কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় উঠে ওঁর উরুতে মেরে দিয়েছে।

শ্যামলবাবু ছিটকে পড়লেন দূরে। হাত-পা-ছড়িয়ে, লুঙি উড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরটাকে শেষ করলাম আমি।

... ...

রক্তে ভেসে যাচ্ছিলেন উনি। বাম উরু থেকে শুরু করে কুচকি অবধি একটা গভীর ক্ষত লম্বালম্বি চলে গেছে। তক্ষুনি একজন মুহুরী সাইকেলে লণ্ঠন ঝুলিয়ে চলে গেলো আমাদের ডেরায়। পাইকারকে সঙ্গে করে জীপ নিয়ে আসছে। [illegible] হাসপাতালে এক্ষুনি নিয়ে

যেতে হবে ওঁকে

... ...

একটু পর শ্যামলবাবু বললেন, তোরা সব ঘর থেকে যা। হাওয়া ছাড় আমায়। আমার গরম লাগছে।

ওরা সকলে ঘর থেকে চলে গেলে হঠাৎ শ্যামলবাবু বললেন, ঋজুবাবু, শুয়োরে কিরকম আওয়াজ করে শুনেছেন ?

আমি অবাক হলাম। বললাম, কি রকম ? ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ?

শ্যামলবাবু হাসলেন। বললেন, আপনি নিশ্চয়ই গান জানেন না। আপনার কান নেই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তাহলে ? কি রকম আওয়াজ করে ?

শ্যামলবাবু বললেন, ভালো করে কান-খাড়া করে শুনবেন। দেখবেন, ওরা বলছে ভোট দাও। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ নয়। ভোট, ভোট।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাইকারা ক্যাম্পের জীপ নিয়ে এলো।

পদ্মাশরে এসে পৌঁছতে পৌঁছতেই পূবের আকাশে আলো ফুটে উঠলো। অংগুলে পৌঁছতে পৌঁছতে বেশ রোদ উঠে গেছিলো। ডাক্তার ভালো করে দেখেশুনে, জায়গাটাতে ডিস-ইন্‌ফেক্‌ট্যান্ট লাগিয়ে সেলাই করে দিলেন। ব্যাণ্ডেজও করে দিলেন ভালো করে। তারপর বললেন, ভবিষ্যতে লাথালাথি করার ইচ্ছে হলে আমাকে বলবেন। আমার বাড়ির গাছ থেকে গোটাকতক বড় কাঁচা বাতাবী-লেবু পাঠিয়ে দেবো। যত খুশি কিক্‌ প্র্যাকটিস্‌ করতে পারেন। এ পর্যন্ত অনেকই শুয়োরে—চেরা কেস দেখেছি মশাই, কিন্তু শুয়োরকে লাথি মারতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে এমনটি দেখিনি কখনও।

... ...

ফেরার সময় আমি বললাম, ডাক্তারবাবু যা বললেন, মনে থাকবে তো ?

শ্যামলবাবু সখেদে বললেন, লাথি কি ওদের মারতে চাই ? না চেয়েছিলাম কখনও ? যে-সব মুখে মারতে চাই সে-সব মুখে লাথি মারার সুযোগ কোথায় আমাদের মতো ছোটখাটো নগণ্য জংলী লোকেদের ?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, আসলে ব্যাপারটা কি জানেন ঋজুবাবু? লাথি আমরা প্রত্যেকেই মারতে চাই কখনও কখনও, কাউকে কাউকে। শুয়োরগুলো উপলক্ষ্য মাত্র। এই লাথি মারার ইচ্ছেটা আমাকে মাঝে মাঝে পাগল করে তোলে, একেবারে উন্মাদ করে তোলে। কিন্তু এই একার দুব্লা পায়ে আর জোর কতটুকু?

তারপরই বললেন, আপনার লাথি মারতে ইচ্ছে করে না?

আমি উত্তর না দিয়ে স্টিয়ারিং ধরে সামনে রাস্তায় চেয়ে রইলাম।

'বিন্যাস' লিখেছিলাম আনন্দবাজারের পুজো সংখ্যাতে ১৯৭৮ অথবা ১৯৪৮ তে। দিল্লীর চিৎকৃত ক্লাস-লেস সোসাইটির ফাঁকা বুলি নিয়ে। আনন্দ পাবলিশার্স বই বের করেন১৯৪৮ তে। তাতে লিখেছিলাম:

"কাল বাসে আসতে আসতে নানা গ্রাম এবং এখানে হেঁটে আসবার সময় গভীর জঙ্গলের মধ্যে আরও যে-কটি গ্রাম দেখলাম, তা দেখে এইই মনে হয়েছে যে, জনসংখ্যাই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। 'পপুলেশান এক্সপ্লোশান' কথাটা কি তা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এই ভয়াবহতা অজানাই থাকে। স্বাধীনতার এত বছর পরেও দেশের সবচেয়ে প্রধান ও মূল সমস্যাটা নিয়ে কোনো দলই মাথা ঘামান না। দেশের ভালো করতে গিয়ে ভোটের ক্ষতি করার মতো মূর্খ রাজনীতিক এদেশে আজকে আর নেইই। বরং প্রতি রাতে যদি নেতাদের নিজেদের বিনা-চেষ্টাতেই ভারতের ধুলোতে-কাদাতে দারিদ্রে তাদের লক্ষ লক্ষ ভোট বাড়ে তাতে তো তাঁদের মঙ্গলই। এই দশরথকে, রামকৃষ্ণকে, রামকে এমন কি নবীন মুহুরীকেও যত সহজে ভোট-দেওয়ানো যায় কোনো মনোমতো বাক্সে, আমাকে দিয়ে তো তা হবে না। তাই, এই আশ্চর্য পরিহাসের গণতন্ত্রের পঙ্কে যত পদ্ম ফোটে, রাজনৈতিক নেতাদের পদযুগল ততই পদ্মশোভিত হয়।

নবীন মুহুরী বললো, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করি। মুর্গী আছে। ডিম আছে। কি খাবেন বলুন স্যার?

আমি বললাম, দশরথরা কী খাবে?

ওদের কথা ছাড়ুন। ওরা যা খায়, খাবে; তা কি আপনি

খেতে পারবেন ? ওরা কি মানুষ নাকি ?

হেসে বললাম, ওরা মানুষ নয় বুঝি ?

মুহুরী বললো, নাঃ। এই জঙ্গলে যেমন নানারকম জানোয়ার আছে, ঝিংক, গন্ধ, পেণ্ড্রা, গুরাণ্ডি, বাবা ; ওরাও ওমনই। ফুল কুড়িয়ে, মূল কুড়িয়ে, মূল খুঁড়ে হাঁচোর-পাঁচোড় করে কোনোক্রমে বেঁচে থাকে। না কাল্‌চার, না এডুকেশান ; না কিছু। ওদের আমি মানুষ বলেই মনে করি না।

সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো যে, ক্ষুদ্রতম পাতিবুর্জোয়াগুলো রাজ-বুর্জোয়াদের চেয়ে অনেকই বেশি ভয়াবহ জীব। কাল রামকে দেখলাম। আজ নবীন মুহুরীকে।

তারপরই বললো, একটু ড্রিঙ্ক করবেন নাকি স্যার ?

আমি অবাক হলাম না। নবীন মুহুরীরাও, কলকাতার ক্লাবে পার্টিতে দেখা সুবেশ, সম্ভ্রান্ত অনেকানেক চরিত্ররই মতো, নিজের শ্রেণীর ভিম থেকে বেরিয়েই অন্য উচ্চতর (?) শ্রেণীতে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে ক্রমাগত।

... ...

নবীন ওর ঘড়ি-পরা হাতটা হাঁটুর উপর চাপড়ে বলল, এই জঙ্গলে একা পড়ে থাকি দশরথদের মতো এই জংলী জানোয়ারদের সঙ্গে। একেবারে বোরড্‌ হয়ে গেলাম স্যার।

আমি বুঝলাম, এই বাক্যটি নিশ্চয়ই তার মালিকের কাছে শোনা। নইলে ওড়িশার গহন জঙ্গলের গ্রাম করত্‌পটার অষ্টম-ফেল ছাত্রর পক্ষে "বোরড্‌ হয়ে গেলাম" এর মতো শহুরে অভিব্যক্তি জানবার কথা নয়।

ছেলেটি বেশ ইন্টারেস্টিং। মালিককে খুব ভালো অনুকরণ করেছে ও। একেবারে প্রোটোটাইপ্‌। মালিকরা এই রকম চাকরদেরই পছন্দ করে। এদেরই উন্নতি হয়। নবীন মুহুরী কখনও হয়তো এই জংলী ঠিকাদারের ব্যবসায় সামান্য অংশের অংশীদারও হবে একদিন। এই একই প্রক্রিয়ায় বড় বড় কোম্পানীর বোর্ডরুমে ঢোকেন এ-বি-সি-ডি শেখা, সিগারমুখো, পাইপ-খেকো লোকেরা। প্রক্রিয়াটা একই।

শুধু ক্ষেত্র ও পরিবেশ আলাদা।”

এই দেশে সেলসম্যান আর দালাল তৈরী করা ইংরিজি-শিক্ষা লক্ষ লক্ষ অমানুষ তৈরী করেছে স্বাধীনতার পর। এরা স্বদেশকে জানে না, স্বজনকে ভালোবাসে না। এদের বেশির ভাগই শুধু নিজের ভালো, নিজের বাড়ি, নিজের গাড়ি, নিজের স্ত্রী—সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েই ব্যস্ত। দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা ভালো না হলে তাদের এই ভালোত্ব যে এক পরিহাসেই, চরম দুর্দশাতেই, রূপান্তরিত হবে একদিন, এ কথা এঁরা বিশ্বাস করেন না। এঁরা বলেন, ভারতে কোনোদিনও সোশ্যালিজম্ আসবে না। ও এক ফালতু বুলি। তাই খাও—পিও মৌজ করো। একটাই জীবন। এনজয় করে নাও।

দেশের যাঁরা হর্তা—কর্তা, তাঁরাও সোশ্যালিজমের বাণী মুখে বলেন বটে কিন্তু আদপে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বাড়ির কাজের লোককে কত মাইনে দেন, সাধারণ মানুষকে কি চোখে দেখেন তা দেখেই এই কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। সোশ্যালিজম্-এরও দুরকম হয়। এক ধরনের সোশ্যালিজম্ হচ্ছে প্রান্তরের মধ্যে যে কটি নগণ্য বড় গাছ আছে তাদের কুড়ুল দিয়ে কেটে দাও। সবাই সমান হয়ে যাবে। ইনস্ট্যান্ট্ সোশ্যালিজম্। সর্বহারারা খুশি হবে। অন্যরকম সোশ্যা-লিজম্ হচ্ছে বড় গাছগুলোকে কেটে-ছেঁটে তারা যাতে দৈত্যকায় না হতে পারে তা দেখে সেই সঙ্গে ছোট গাছগুলিকেও জল দিয়ে, সার দিয়ে, সবরকমভাবে পুষ্ট করে বড় করে তোলো। যে দেশের সব গাছ, সব মানুষই বড়, সেই দেশেই তো আদর্শ সোশ্যালিজম্ থাকার কথা। যারা বড়, তাদের সবাইকেই ন্যাংটো করে, লুটে-পাটে সর্বহারা বানিয়ে দিয়ে সর্বহারাদের খুশি করে, সর্বহারাদের জন্যে কিছুমাত্রই না করে সকলকেই সর্বহারা করে, দেশকে মরুভূমি করে যে সোশ্যালিজম্ আসে তা পুঁথিরই সোশ্যালিজম্; জীবনের নয়।

এই কথাও লিখেছিলাম, আয়নার সামনেতে। লিখেছিলাম পনেরো বছর আগে। ‘ভাবার সময়ে’ আমার পুরোণো সব উপলব্ধি আর বিশ্বাসের কথাই নতুন করে বলতে বসেছি।

"অন্ দ্যা ওয়ে হোম ইয়েসটারডে উই মেট দ্যা এনটায়ার ইম্পীরিয়াল ফ্যামিলী। উই সে দেম ফ্রম অ্যাফার। গ্যেটে রীলিজড্ মাই আর্ম ইন অর্ডার টু টেক-আপ আ পজিশান বাই দ্যা সাইড অফ দ্যা রোড। নো ম্যাটার হোয়াট আই সেইড ইট ওজ্ ইমপসিবল্ টু মুভ হিম আ সিংগল্ স্টেপ ফারদার।

আই পুলড্ মাই হ্যাট ওভার মাই আইজ, বাটনড্-আপ মাই কোট অ্যাণ্ড ওয়াকড্ উইথ মাই আর্মস্ ক্রসড্, রাইট থ্রু দ্যা ডেন্স থ্রং।

প্রিন্সেস অ্যাণ্ড কোর্টিয়ারস্ স্টুড ইন রো'জ অন আইদার সাইড। দ্যা এমপ্রেস্ ওজ্ দ্যা ফার্স্ট টু গ্রীট মা অ্যাণ্ড দেন ডিউক রুডল্ফ্ টুক অফ্ফ্ হিজ টু হ্যাট মী। দ্যা হোল কোম্পানী রেকগ্নাইজড্ মী। ইট ওজ্ আ রিয়্যাল প্লেজার টু ওয়াচ্ দ্যা প্রসেশান্ পাসিং গ্যেটে, হু স্টুড বাই দ্যা সাইড অফ দ্যা রোড উইথ হিজ হ্যাট ইন হিজ হ্যাণ্ড, বোয়িং ডেফারেন্সিয়ালী।

হোয়েন সাচ্ মেন অ্যাজ মাইসেল্ফ্ অ্যাণ্ড গ্যেটে মীট, দীজ ফাইন্ পার্সোনেজেস্ মে ওয়েল নোট হুম উই কনসিডার গ্রেট।

"আফটারওয়ার্ডস্ আই রিপ্রিমেণ্ডেড হিম সিভিয়ারলী অ্যাণ্ড কনফ্রণ্টেড হিম উইথ ওল্ হিজ সীনস, শোয়িং নো মার্সী।"

—লুডউইগ্ ভ্যান্ বীটোভেন।

বামফ্রন্ট সরকার তো মার্কসিষ্ট-লেনিনিস্ট। কিন্তু তাঁদের কার্যকলাপেও তাকি পুরোপুরী প্রমাণ হয় না?

টোটাল কম্যুনিজম্ এ ব্যক্তিস্বাধানতা থাকে না। ব্যক্তিকে নাম্বারে পরিণত করা হয়। ব্যক্তি বা নিছক রোবোটে রূপান্তরিত হয় বলেই ব্যক্তি হিসেবে টোটাল কম্যুনিজম্‌কে আমার ভালো লাগে না।

কিন্তু দেশের সব মানুষ ভালো খেতে পাক, ভালো পরতে পাক, ঝড়ের রাতে, শীতের রাতে, প্রখর গ্রীষ্মের দুপুরে তারা যেন স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভালোভাবে থাকে এইটুকু সামান্য আশা তো যে কোনো উদার-মনস্ক, শিক্ষিত মানুষেরই থাকা উচিত। আমি একাই ভালো থাকব, ভালো খাবো, ভালো পরব আর অন্যেরা না খেয়ে থাকবে এমন ভাবাও তো জাত-পাতের বিশ্বাসের মতোই ভ্রান্ত বিশ্বাস। প্রথমে সকলেরই ভালো হোক, তারপর যোগ্যতার কারণে কেউ যদি বেশি ভালো থাকে তা ভালো কথা। এই সাদামাঠা কথার মধ্যে 'ইজম টিজমকে' টানাটানি করার দরকার কি?

রবীন্দ্রনাথের সেই গান আছে না?

"ওদের কথায় ধাঁদা লাগে তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি।"

সে গানে ঈশ্বরের কথা বলা হচ্ছে। এখানে আবার ঈশ্বর। স্বামী বিবেকানন্দর ঈশ্বর; গৌতম বুদ্ধর ঈশ্বর; মানুষ-নারায়ণ।

"জীবে দয়া করে যেই জন　　সেই জন সেবছে ঈশ্বর।"

এই মহান, বিরাট স্বরাট দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিচিত্র পোশাকের প্রত্যেক মানুষই আমার ভাই, তারাই আমার ঈশ্বরের প্রতিভূ। আমার ঈশ্বর মন্দিরে থাকেন না। মসজিদ বা গীর্জাতেও নয়; সেই ঈশ্বরের বাস এই দেশের ধুলি-মলিন গ্রামে-গঞ্জে, জঙ্গলে-পাহাড়ে। তাদের প্রত্যেকের সুন্দর বুভুক্ষু মুখচ্ছবির মধ্যেই আমার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি আমি চিরদিন।

জাত-পাতের ভেদ তো এখনও চলছেই। শুধু বিহারে হরিয়া[illegible]

নয়। কলকাতাতেও চলছে। এক্ষুণি আমার স্ত্রী বললেন যে আমাদের বাড়ির নতুন রাঁধুনী মেয়েটি তার জাত্যবোধ নতুন করে আগ্নেয়গিরির মতো অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়ে কাজের ছেলেটিকে যে জাতে মেথর তাকে জাততুলে অপমান করেছিলো বলে আমার মেয়েরা তাকে বকাতে সে রান্না অসমাপ্ত রেখেই, "ধোপা-মেথরের রান্না করার আমার দরকার নেই" বলে চলে গেল এক্ষুনি মাইনে নিয়ে।

মানুষ যদি অন্য মানুষকে মানুষের মর্যাদাটুকুও বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজীর শিক্ষায় শিক্ষিত দেশে, মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট, মাও-সে-তুং-এর উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত দেশে, সোশ্যালিজম্ এ "কমিটেড" প্রধানমন্ত্রীর দেশে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও না দেয়, তবে বুঝতে হবে কোথাও কোনো বড় গোল হচ্ছে বামপন্থীদেরও।

মনে হয়, এই গোলটা হচ্ছে প্র্যাকটিস্ আর থীওরীর জট-পাকানোতে। থীওরী ইজ বীইং পুট "লাইক দ্যা কার্ট বিফোর দ্যা হর্স"। এবং ফলে যা হবার তাইই হচ্ছে। থীওরী আর প্র্যাকটিসে ধ্বস্তাধ্বস্তি আর কুস্তী হচ্ছে, চতুর্দিকে জল যতোটা ছিটছে দেশ সেই অনুপাতে একটুও এগোচ্ছে না। এগোয়নি।

পুঁথিতে সাধারণ, সামান্য-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত এবং অধিকাংশই আর্থিক ভাবে অত্যন্ত দুর্বল মানুষদের কোনোই আগ্রহ নেই। তাঁরা ফল দেখতে চান। এবং এক্ষুনি। তত্ত্বতেও আগ্রহ নেই তাঁদের।

ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিন এর বইয়ে "থীওরী এণ্ড প্র্যাকটিস্" বলে একটি আলাদা অধ্যায় আছে। বিদ্বান, প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং তাত্ত্বিক বামপন্থী নেতাদের এসব বই নিশ্চয়ই পড়া আছে। কিন্তু আমি সেই অধ্যায়ের বিভিন্ন জায়গা থেকে সামান্য উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

কাজ না করলে, এবং আন্তরিকতা না থাকলে এবং তত্ত্ব এবং কাজের সুষ্ঠু সংমিশ্রণ না হলে কম্যুনিজম্ কেন ক্যাপিটালিজম্ও বানচাল হয়ে যেতে বাধ্য। তাছাড়া, নিজের দেশের অবস্থা ও বিশেষ গুণাগুণকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন হো-চি-মিন। বাইরের ফুল গাছ এনে দেশের মাটিতে পুঁতে সবসময় ফল যে পাওয়া যায় না তা আমি

আগে বলেছি। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে নিজেদের শিক্ষা নেওয়ার কথাও উনি বলেছেন। সব দেশের শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে নিজের দেশের উপযুক্ত করে নিলেই সেই তত্ত্ব যে তত্ত্বই হোক না কেন, তাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গর বামফ্রন্ট সরকার দশ বছরেও যে তেমন কিছু করতে পারলেন না কেন্দ্রর অসহযোগিতা ছাড়াও তাঁদের থীওরীর আর প্র্যাকটিসের গণ্ডগোলও বোধহয় তার আরেকটি প্রধান কারণ।

সাধারণ মানুষের ধৈর্য শেষ হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি যে দলই পশ্চিমবঙ্গর মানুষের অবস্থা ফিরোতে পারবেন, বাংলার বাঙালী হিসেবে মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে দেবেন, এ রাজ্যের মানুষ সেই দলকেই ভোট দেবেন। ডান-বাম তত্ত্ব এসব বড় বড় ব্যাপারে সাধারণ, সামান্য-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত এবং অধিকাংশই আর্থিকভাবে অত্যন্ত দুবল মানুষদের কোনোই আগ্রহ নেই। আপনারা প্রত্যেকেই এখন ফল দেখতে চান এবং তাড়াতাড়ি, এক্ষুনিই।

হো-চি-মিন বলেছেন :

"দীজ টাস্কস্ মাস্ট বী আণ্ডারটেকন ইন দ্যা পার্টিকুলার কণ্ডিশানস্ অফ আওয়ার কান্ট্রী, দ্যাট অন দ্যা বেসিস অফ আ ভেরী ব্যাকওয়ার্ড কানট্রী নিউলী ফ্রীড ফ্রম কলোনিয়াল অ্যাণ্ড ফিউড্যাল্ রুল অ্যাণ্ড বীইং ডিভাইডেড ইনটু্য টু জোনস্"।

আমাদের ভারতের এবং বিশেষ করে বাংলার স্বাধীনতার পরের অবস্থার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এই অবস্থা।

তারপর বলছেন :

"ইন সাচ্ কণ্ডিশানস্ হোয়াট মাস্ট বী আওয়ার মেথড, ফর্ম অ্যাণ্ড স্পীড ট্যু গ্র্যাজুয়ালী অ্যাডভান্স ট্যু সোশ্যালিজম্? দেয়ার আর প্রবলেমস্ ফেসিং আওয়ার পার্টি অ্যাট দা প্রেজেণ্ট টাইম। টু সল্ভ্ দীজ উইথ লেস গ্রোপিংস্ অ্যাণ্ড এররস্ উই মাস্ট লার্ন ফ্রম দ্যা এক্সপীরিয়েন্সেস এফ দ্যা ব্রাদার-কান্ট্রিজ অ্যাণ্ড অ্যাপ্লাই দেম ইন আ ক্রিয়েটিভ ওয়ে। উই হ্যাভ টু ইনটেন্সিফাই আওয়ার মার্ক্সিস্ট-

লেনিনিস্ট, ট্রেনিং ইন অর্ডার টু অ্যাপ্লাই দ্যা মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট, স্ট্যাণ্ড, ভিউ-পয়েন্ট অ্যাণ্ড মেথড, অ্যাণ্ড কারেক্টলী অ্যানালাইজ দ্যা পিক্যুলারিটিজ অফ আওয়ার কান্ট্রি, ”

এর পরেই হো-চি-মিন যা বলেছেন সেই কথাকটি সোশ্যালিজম্ এ কমিটেড কেন্দ্র এবং বামপন্থী রাজ্য সরকারের দলগুলির প্রত্যেকেরই মনোযোগের সঙ্গে পড়া উচিত।

উনি বলছেন ঃ

“সোসাইটি ক্যানট বী ট্রানস্ফর্মড আনলেস্ দ্যা পার্টি মেম্বারস্ ট্রানস্ফর্ম অ্যাণ্ড এলিভেট দেমসেল্ভস্”।

এতো ‘আয়নার সামনে’র রাজিন্দরেরই কথা। কুকুরের বাচ্চার নেতা বাঘের বাচ্চা হয় না। বাঘের সমাজ গড়তে হলে বাঘেদের দ্বারাই তা গড়া সম্ভব।

এই কথাটিই বোধহয় আমাদের দেশের বিভিন্ন দল এবং দলের নেতারা বুঝতে পারছেন না এতো দিনেও। গান্ধীজী, অথবা নেতাজী, অথবা জওহরলাল, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অথবা প্রমোদ দাশগুপ্তর মতো ব্যক্তিগতভাবে সৎ এবং পরিচ্ছন্ন নেতা থাকলেই হবে না, দলের প্রত্যেক কর্মীকেও একটি বিশেষ উচ্চতায় উঠিয়ে আনতে হবে। তাঁরা এক-ধরনের ব্যবহার, একধরনের নৈতিক ও ব্যক্তিগত দর্শনের, জীবনযাত্রার পথে চলবেন আর জনগণ, যাঁদের ভালো করার জন্যেই প্রত্যেক দলের সৃষ্টি, তাঁদের জীবনযাত্রার সঙ্গে, শুভাশুভর সঙ্গে দলের কর্মীদের জীবন-যাত্রার ও জীবনদর্শনের কোনোই সাযুজ্য থাকবে না এমন অবস্থা হলে সমাজ ও দেশের উন্নতি অসম্ভব।

অন্য দিক দিয়ে ভেবে দেখতে হলে বলতে হয়, নেতা যত বড়ই হোন না কেন, যতই সৎ, তাঁর দলকে নিয়মানুবর্তীতা, সততা, একতা এবং তাঁর ব্যক্তিগত মানের কাছাকাছিও টেনে তুলতে না পারলে সে দল অপারগই হন হয়তো! যেমন জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো সৎ মানুষের দল। আপনাদের একসময় নিশ্চয়ই মনে হয়েছিলো যে তিনিই ভারতকে নতুন এবং প্রকৃত মুক্তির পথে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এই

মেকী গণতন্ত্রে প্রকৃত বিরোধীতা যা শাসকদলের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে কখনও শাসকদল বরদাস্ত করেননি। জয়প্রকাশকে জেলে দিয়েছিলেন ইন্দিরা। শুধু তাঁকে নন অনেককেই। দিল্লীর দেওয়ালে দেওয়ালে জয়প্রকাশ নারায়ণ বিদেশীদের হাত থেকে টাকা নিচ্ছেন এমন পোস্টার পড়েছিলো অগণ্য। মিথ্যার বেসাতিতে কেউই পেছিয়ে নেই এখানে।

যেদিন এমার্জেন্সী ঘোষিত হয় সেইদিনই তা না জেনেই সকালের ফ্লাইটে কলকাতা থেকে আমি দিল্লী গিয়ে পৌঁছই নিজের কাজে। সেদিন দিল্লীর যে অবস্থা দেখেছিলাম, তা কখনও ভুলব না। হোটেলে পৌছেই জানতে পারি যে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছে।

দুপুরে "ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস" কাগজ বেরুলো, কালো বর্ডার দিয়ে। সম্পাদকীয় স্তম্ভটি সাদা ছিলো। কনট-সার্কাসে ভ্যান এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই কাগজ ছিনিমিনি হতে হতেই কিছু একটা ঘটলো।

'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' এর বাড়িটি মস্ত বড়। তাতে অন্যান্য নানা অফিসও আছে। যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসও, মিনারেলস্ এণ্ড মেটালস্ ট্রেডিং করপোরেশান (এম. এম. টি. সি'র) কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত বাড়ির বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হলো যাতে কাগজ না ছাপা হতে পারে। তখন দিল্লীতে "দ্যা স্টেটসম্যান"এ কি হয়েছিলো জানি না কারণ সেবার এক বাঙালী কোম্পানীর কাজে গেছিলাম। সেই কোম্পানীর ডিরেক্টরও সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি বরাবর যে ছোট্ট হোটেলে ওঠেন সেই হোটেলটি ছিলো ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাল্ডিং এর কাছাকাছি, তাই ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ঘটনাটা জানি।

তবে স্টেটসম্যান, একটি বই প্রকাশ করেছিলেন পরে,। "হোয়াট প্রাইস? আ ফ্রী প্রেস?" তাতে 'দ্যা স্টেটসম্যানে'র সঙ্গে ইন্দিরা সরকার যে কী ব্যবহার করেছিলেন কাগজটিকে নাস্তানাবুদ করার জন্যে, তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। 'দ্যা স্টেটসম্যান' এর তৎকালীন সম্পাদক এবং কর্তৃপক্ষও অন্য ধাতুতে তৈরী ছিলেন। তাঁরা সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে যে দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন তা ভারতের

গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে, গণতান্ত্রিক নীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে অবশ্যই সাহায্য করেছিলো। দেশের প্রত্যেকটি সংবাদপত্ররই এবং প্রত্যেক গণতন্ত্রে-বিশ্বাসী মানুষেরই "ষ্ট্যা স্টেটসম্যানের" এই ভূমিকার জন্যে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যদি এ দেশে গণতন্ত্র কায়েম রাখতে হয় ভবিষ্যতে।

সেই দিন ভোরে এবং রাতে দিল্লী শহরে যে ফিস-ফাস্, নর্থ-ব্লক এবং সাউথ-ব্লক এর অফিসে কর্মচারীদের যে বোবা, নিথর-চোখের ভীতগ্রস্ততা, পথে-ঘাটের মানুষ, ট্যাক্সি-ড্রাইভার থেকে দোকানদারদেরও যে মানসিকতা দেখেছিলাম তা দেখে স্বৈরতন্ত্র অথবা টোটাল-কম্যুনিজম্ কাকে বলে তার কিছুটা আভাস পেয়েছিলাম।

রাশিয়া এবং চীনে আমি যাইনি। যদি স্বাধীনভাবে ঘুরে ফিরেই না বেড়াতে পারি, যদি চোরের মতো মুখ নীচু করে তাঁদের দেওয়া সঙ্গীর সঙ্গেই চলতে-ফিরতে হয়, যদি সেই দেশ, দেশের মানুষকে ভালোভাবে জানার সুযোগই না পাওয়া যায় তবে গিয়েই বা কি লাভ ?

এই প্রসঙ্গে গর্বাচভ সাহেবের সম্বন্ধে দু একটি ভালো কথা না বলে পারছি না। উনি কিন্তু সমস্ত বিশ্বে শুভ বোধ, শান্তি, তারুণ্য এবং প্রীতিকে আন্তরিকভাবেই ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। বিশ্বের অন্য অনেক তা'বড় তা'বড় দেশ তাঁর সঙ্গে হাত যে মেলালেন না সে জন্যে এই পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার ক্ষণ হয়তো ত্বরান্বিতও হতে পারে।

এই নতুন পৃথিবীতে, এই নতুন ভাবধারা. জীবনযাত্রার মানের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই সুন্দর বিরাট দেশ যে কোথায় পড়ে আছে, দেশের সাধারণ মানুষ যে কেমন জীবন যাপন করছেন আজকেও তা ভাবলেই গলার কাছে কা যেন দলা পাকিয়ে আসে। বড় কষ্ট হয়।

আমি তো সামান্য লোকই মাত্র। রাজনীতিক বা নেতা তো নই। অন্যর কষ্ট বুঝে, তা অনুভব করে শুধুমাত্র প্রকাশই করতে পারি। প্রতিকার করি এমন শক্তি তো আমার নেই। অনেকে বলেন যে 'আ

পেন ইজ মাইটীয়ার দ্যান স্যা সোর্ড'। কিন্তু তেমন কলম তো সরস্বতী সব লোককে দেন না।

হো-চি-মিন এর কথাতেই আবার ফিরি।

ঐ 'থীওরী অ্যাণ্ড প্র্যাক্‌টিস্' অধ্যায়ের অন্যত্র তিনি বলছেন :

"ইট রিকুয়্যাস্ দেম টু ওভারকাম ব্যুরোক্র্যাসী অ্যাণ্ড হ্যারো-মাইণ্ডেডনেস্ ইন অর্ডার টু মেইনটেইন ক্লোজ কনটাক্ট উইস দ্যা মাসেস……বিকজ সোশ্যালিজম্ ক্যান বী বীল্ট ওন্‌লী বাই দ্যা ক্রিয়েটিভ লেবার অফ ফুল্‌লী কন্‌সাস্ পীপল্

এই কথা কটির প্রতি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মনোযোগ থাকবে বলে আশা করব। কাজ না করলে কোনো জাতই বড় হয় না। "ওয়ার্ক ইজ্ ওর্‌শিপ্।" জনগণকে নিষ্কলঙ্ক সৎ নেতৃত্ব যদি জাগিয়ে দিতে পেরে এই বিরাট কর্মকাণ্ডে ব্রতী না করাতে পারেন তবে "সোশ্যা-লিজম্" শুধু 'কথারই কথা' হয়ে থেকে যাবে মঞ্চে-দাঁড়ানো ভাড়া-করে-আনা মানুষদের সামনে পঞ্চাশটি অ্যাম্লিফায়ার লাগানো গম্‌গমে বক্তৃতাতেই।

হো-চি-মিন ঐ অধ্যায়েরই অন্য জায়গাতে বলছেন যে-কথা, যাঁরা লেনিনের অনুগামী এ দেশে ; তাঁদের বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য।

বলছেন :

"লেনিন রীপিটেড ওভার এণ্ড ওভার এগেইন্ দ্যাট রেভল্যুশানারী থীওরী ইজ নট ডগ্‌মা বাট আ গাইড টু রেভল্যুশানারী অ্যাক্‌শান্ ; অ্যাণ্ড দ্যাট ইট ইজ নট সামথিং রিজিড, বাট অফ ক্রিয়েটিভ নেচার ; দ্যাট থীওরী নীডস্ টু বী কন্‌স্ট্যান্ট্‌লী ইম্‌প্রুভড বাই নিউ কনক্লুশানস্ ড্রন ফ্রম লিভিং প্র্যাকটিস্, কম্যুনিস্টস্ অফ ভেরিয়াস্ কানট্রীজ মাস্ট পুট মার্কসিজম্-লেনিনিজম্ ইন কনক্রীট ফর্ম প্রপার টু সারকামস্ট্যানসেস্ অফ দ্যা গিভন্ টাইম অ্যাণ্ড অফ দ্যা গিভন প্লেস।"

কোন দেশ, কোন সময় আমাদের সামনে আছে তা না ভেবে, না দেখে, শুধুই থীওরী অ্যাপ্লাই করে এসেছেন আমাদের দেশের মার্কসিস্ট-

লেনিনিস্টরা। তাইই হয়তো বীতশ্রদ্ধ হয়ে, আর ধৈর্য না ধরতে পেরে তাঁদেরই কেউ কেউ মাও-পন্থী হয়ে নকশাল হয়ে গেছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন সমস্ত ক্ষমতার উৎস হচ্ছে বন্দুকের নল।

এই দেশকে বাঁচাতে হলে দেশের মানুষদের মানুষের মতো মানুষের জীবন দিতে হলে বামপন্থীদের যেমন, তেমনই আমাদের সোশ্যালিজম্ এ কমিটেড প্রধানমন্ত্রীকেও এই কথাগুলি মনে রাখতে হবে।

আপনাদেরও প্রত্যেককে জেগে থাকতে হবে। ঘুমোনোর সময় চলে গেছে। সময় আর সত্যিই বেশি নেই। যেমন নেই ডান এবং বাম দলগুলির হাতে তেমন নেই আপনাদের হাতেও।

আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি বিশেষতঃ তরুণ প্রধানমন্ত্রী, তরুণ কংগ্রেস ও বামপন্থীদের তরুণ প্রত্যেক (নেতাদেরই) প্রতি আমার শুভ কামনা রইল। তারুণ্যর জয় হোক। আপনাদের এবং আপনাদের নির্বাচিত প্রত্যেক প্রতিনিধির হাতে দেশবাসী হিসেবে আমার প্রীতি আজ রাখীরই মতো বেঁধে দিলাম দোলপূর্ণিমা এবং হোলির আগে। এই প্রার্থনা নিয়ে যে আমার এই সুন্দর দেশ আর তার সরল, ভালো, কোটি কোটি মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াক।

বন্দেমাতরম্।